নিবেদন।

যখন যেখানে যে কোন দেশ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছে। সাহিত্যসেবাই তখন তাহার মূলীভূত কারণরূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচার, জাতীয় জীবন-গঠণের একমাত্র কারণ ইহা কে না স্বীকার করিবে? রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, আর ধর্ম্মেতিহাসই বল; জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ব্যতীত এ সকলের উন্নতি সুদূর পরাহত। জাতীয় সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া কখন কোন দেশ বা কোন জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই; ইতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রাচীন রোম এককালে এই জাতীয় সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জগতীতলে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। আর আধুনিক ইউরোপও যে আজকাল এত বড় হইয়াছে, সে কেবল সাহিত্যের প্রচার বৃদ্ধি করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াই ইংরাজ জাতি আজ জগতের মধ্যে অগ্রগণ্য, তাহাদের যশো-সৌরভে আজ চারিদিক পরিপূরিত।

সকল দেশেই সাহিত্যের আদর আছে। সভ্যজাতি মাত্রেই আপন আপন সাহিত্যের আদর ও তাহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকেন। আদর নাই কেবল পোড়া বাঙ্গলা দেশে—বাঙ্গালী বাবুগণের নিকটে। এক্ষণে যাঁহারা ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, কোন বিষয়েই ভালরূপ শিক্ষিত নহেন, সামান্য মাত্র শিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাও অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন, "বাঙ্গলা কি আবার ভাষা, উহা আবার পড়িব কি?" এই ত দেশের অবস্থা, এই ত স্বজাতীয়ের

নিকট জাতীয় সাহিত্যের আদর। ইহার আদর যে ছিল না তাহা নহে; পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই। কেন যে নাই, তাহার কারণ নির্দেশ করা বড়ই দুঃসাধ্য। এখন ইরাজী সাহিত্যেই অর্থের পথ মুক্ত করিয়া দেয়; ইংরাজী কথা কহিতে পারিলে সকলের নিকট সম্মান বৃদ্ধি হয়; আর বাঙ্গালা সাহিত্যে এ সকল হয় না—ইহাতে চাকুরীর উন্নতি করিয়া দিতে পারে না বলিয়াই বুঝি, তাহার প্রতি সকলে এত হতাদর?

আদর থাক আর নাই থাক। একদিন না একদিন এই জাতীয় সাহিত্যই আমাদিগকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিবে, একদিন না একদিন এই অভিশপ্ত, পতিত, অধম বঙ্গবাসী জাতীয় সাহিত্যের প্রভাবে জগতে সর্ব্বপ্রধান জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে, পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আবার তাহারা আপনাকে চিনিতে পারিবে, জাতীয় সাহিত্যের সহিত পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিবে।

ধর্ম্মই যে জীবের বল, বুদ্ধি, ভরসা; ধর্ম্মবলই যে সংসার সংগ্রামে জয় লাভের একমাত্র উপায়, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধী করিতে পারিবেন। ধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে সাহিত্যের উন্নতি করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্য সেবীর আদর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহার শত শত প্রমাণ নয়নের সম্মুখে বর্ত্তমান। সুসভ্য ইংলণ্ডে, যাহার অনুকরণ প্রিয়তা আমাদের মধ্যে এক্ষণে সংক্রামক রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই দেশে গ্রন্থকারগণ গ্রন্থলিখিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, আর এ দেশের গ্রন্থকারগণ নিরন্ন, অভাবের ক্রীতদাস হইয়া আজীবন দুঃখভোগ করিতেছে। এইত দেশের অবস্থা; এইত স্বদেশবাসীর স্বদেশ প্রিয়তা; কিন্তু এক্ষণে যেন সে গতির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া বোধ হয়; এক্ষণে বঙ্গবাসী আপনাকে

চিনিতে পারিতেছে, আপনার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছে, আজ সেই সাহসে বুক বাঁধিয়া আমার "তাপস কুমার" উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ পুনরায় জন-সাধারণে প্রকাশিত হইল। এবার ইহার স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। মৎপ্রণীত সকল পুস্তকই প্রায় পাঁচ ছয় সংস্করণ হইয়া সাধারণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা আমার ন্যায় হীনমতি গ্রন্থকারের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় ন[illegible] এক্ষণে আশার মাটীতে বীজ অঙ্কুরিত হইল। বৃক্ষরূপে পরিণ[illegible] সুফল প্রসব করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। নিবেদন ই[illegible]

৮৩নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।
আলোচনা সমিতি।
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১১ সাল।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

The Salkia Printing Works.

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার

অসীম বাৎসল্য স্নেহে আমি আজীবন প্রতিপালিত ;

যাঁহার

প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্মময় উপদেশাবলী আমার

কর্ম্মময় জীবনকে ধর্ম্মপথগামী করিতে

সতত সচেষ্ট ছিল ;—

সেই পরম পূজনীয়, ইহকালের একমাত্র আরাধ্য দেবতা

ধার্ম্মিকপ্রবর স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

পবিত্র শ্রীচরণ কমলোদ্দেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

তাঁহার অধমাধম সন্তান কর্ত্তৃক

ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত

হইল।
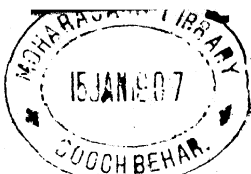
⋙ তাপস-কুমার। ⋘

উপক্রমণিকা।

আজমীর প্রদেশে, আরবল্লী পর্ব্বতের উন্নত শৃঙ্গ যেন সুনীল গগণকে স্পর্শ করিবার মানসে হস্ত বাড়াইতেছে। স্থানে স্থানে বহুমূল্য প্রস্তর খণ্ড অপূর্ব্ব প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে। পর্ব্বতের নির্ঝরবারি যেন স্বভাবের কর্ণতৃপ্তিকর বীণা বাজাইতেছে। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বিজন কানন। কোন স্থানে রজতপিণ্ড সদৃশ শ্বেতপ্রস্তর শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া, তদীয় প্রভাজালে কাননভূমি প্রতিবিম্বিত করিতেছে। পর্ব্বতগুহা চির-তিমিরাবৃত, কৃষ্ণা রজনীর অপূর্ব্ব কারাবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দূর হইতে উচ্চ স্থান সমূহের প্রকৃত মাধুর্য্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকস্থ বিজন কাননে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের ভীষণ শব্দে কাননভূমি প্রকম্পিত হইতেছে, তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই আবার মৃগগণ দলবদ্ধ হইয়া ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! এখানে কি হিংসা নাই! ব্যাঘ্র-ভক্ষ্য মৃগ নিকট

দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তথাপি ব্যাঘ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই স্থান কি প্রকৃতির বিলাস ভবন? তাহা না হইলে হিংস্রজন্তুগণ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া, এখানে এরূপভাবে বিচরণ করিতেছে ইহার কারণ কি? কাননের চতুর্দ্দিকে জটিল জঙ্গল, এখানে মনুষ্য সমাগমও সাধ্যাতীত। তবে এ বিজন বিপিনে নিরাশ্রয় তিনদিনের শিশু কোথা হইতে আসিল। শিশুটী ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, ইহার অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়, কিন্তু এ জনশূন্য প্রদেশে ইহার কাতর ক্রন্দন নিবারণ করিবে কে? কেহই ত নিবারণ করিতেছে না? সহকার তরুর সহিত বনজ লতার কি দয়া মায়া নাই? অনিশ-সুগন্ধি-ফুল্ল কুসুমে ভ্রমর গুন্ গুন্ স্বরে তান ছাড়িতেছে, কিন্তু ভ্রমরও ত শিশুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মধু-দানে তাহার জীবন রক্ষা করিতেছে না? বুঝিয়াছি, জগতে সকলেই আপনার সুখের জন্য ব্যস্ত! কেহই পরের ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না! হায়! কোন্ অভাগিনী এই শিশুটিকে কানন মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে? তাহার ক্রন্দন-স্বর কানন ভেদ করিয়া গগনে লয় হইয়া যাইতেছে। আহা! কেহই ত নিবারণ করিতেছে না? চারিদিকে হিংস্রজন্তু দলে দলে বিচরণ করিতেছে, তাহারাও ত শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছে না? কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিশুর কোমল কণ্ঠ যে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহার যে কাঁদিবার শক্তি একেবারে রহিত হইয়া গেল। বনদেবি! মা! আপনার শান্তিময় কানন-রাজ্যে নিরাশ্রয় তিনদিনের শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে, শিশুটীকে রক্ষা করুন। দেবি! আপনার এই হিংসা-দ্বেষ বিবর্জ্জিত শান্তিরাজ্যে কোন্ পাষণ্ড এই শিশুটীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই? ইহার প্রফুল্ল মুখ কমল সন্দর্শন করিলে নির্দ্দয় লোকের হৃদয়ও স্নেহাভিষিক্ত হয়। যাহার মুখ কমল দর্শন করিলে কমল লজ্জিত হয়, যে শিশুর

মুখারবিন্দ দেখিলে সন্তাপিত ব্যক্তির সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত হয়; ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করে; দেবি! সেই ফুল্লেন্দিবর সদৃশ, কোমল প্রাণ শিশুকে কোন্ নরাধম বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? সেই পাষণ্ডের হৃদয় কি পাষাণ নির্ম্মিত? ওহো! বুঝিয়াছি, সেই দুরাত্মা ক্রূর হইতেও ক্রূরতম। শিশুর কাতর রোদন শ্রবণে, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বন্য-জন্তুগণ আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্ঠন করিল। বনদেবীও শিশুটীর ক্লেশ আর দেখিতে না পারিয়া যেন তরুপত্রগুলি তরুশাখায় বিন্যস্ত করতঃ দিবাকরের কিরণ রোধ করিবার মানসে, তাহাকে স্নিগ্ধ করিবার আশায় সুমন্দ মরুত-হিল্লোলে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শান্তিময়ী বনদেবীর শান্তি নিকেতনে প্রবেশ করিলে সকলের অন্তঃকরণই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা সকল মনোহর বস্তুর একত্র সমাবেশে এই তপোবনের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই কাননরাজ্য ঋতুরাজের রাজভবন। এখানে সকলেই মনসুখে কালযাপন করিতেছে। এথায় যোগনিরত যোগী গণের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ ফল মূল, পরিধানের নিমিত্ত তরুবল্কল, যথাবিধানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। কুসুম ভারাবনত বৃক্ষরাজিও শিশুটীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, পাছে তাহার কোন বিপদ হয়, এই আশঙ্কায় নানা বর্ণের নানা পত্র রাজছত্ররূপে স্বহস্তে তাহার শিরে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ফলবান বৃক্ষ সকল শিশুটীর ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন মৃতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তরুশাখোপরি পিকরাজ কুহু কুহু স্বরে তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ জ্ঞাপন করিতেছে। পিকরাজের সেই মর্ম্মভেদী কুহু কুহুধ্বনি শ্রবণ করিলে অন্তরের সহস্র বন্ধনী শিথিল হইয়া যায়। কোকিলের কাতর কুহুরব শ্রবণ করিয়া বৃক্ষান্তরে পাপিয়াও বুঝি আর থাকিতে পারিল না, সেও স্বভাবজাত পঞ্চমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া জগতের লোককে জানাইতে লাগিল যে—হে জগতবাসীগণ! আর এ

দুঃখ দেখিতে পারা যায় না, কি করি, কি করি, চোক গেল, চোক গেল, বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। হলুদে পাখি, সে আর একটি বৃক্ষশাখায় বসিয়া রমণীগণকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—কামিনীগণ! সন্তান যে কি অমূল্য বস্তু তাহা তোমরা জাননা; এখন জানাব কেন, যখন তোমাদের খোকা হইবে, তখন জানিতে পারিবে। এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে "গেরস্ত বৌ তোমাদের খোকা হউক, খোকা হউক" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মধুকরগণ সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া মধু সংগ্রহ করতঃ বৃক্ষান্তরালে একটি মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, বনদেবীর কি অনন্ত মহিমা! যেন মধুচক্র আনিয়া শিশুটীর মস্তকোপরি বিলম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন। মধুমক্ষিকাগণও তাহার দুঃখে দুঃখানুভব করিয়া বিন্দু বিন্দু মধুদানে জীবন রক্ষা করিতেছে।

মধুপানে তাহার ক্ষুধার শান্তি হইল। মুদিত কমল প্রস্ফুটিত হইল; শিশুটী এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রোদন করিতেছিল। মধুপানে ক্ষুধার শান্তি হওয়ায় শিশু চক্ষুরুন্মিলন করিয়া এক্ষণে প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত; মধুপানে এবং সুমন্দ মারুত হিল্লোলে তাহার অবসাদ বিদূরিত হইয়াছে। বনদেবীও এইবার তাহাকে সান্তনা করিয়া নিজ মোহিনী বেশ ধারণ করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ! একবার কমলের শোভা দর্শন করুন। ঐ দেখুন, সূর্য্যদেব শিশুটির কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চিমাকাশের প্রান্তভাগে অঙ্গ লুকাইতেছেন। নক্ষত্ররাজী নবজাত শিশুটিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নীলাকাশে একে একে ফুটিয়া উঠিল। চন্দ্রদেবও অনন্ত আকাশে সমুদিত হইলেন। বনদেবী আজ যেন সান্ধ্যগগণকে নিজ কানন রাজ্যের একখানি মনিময় চন্দ্রাতপ করিয়া রাখিয়াছেন। বসন্তবায়ু নানাজাতীয় ফুলের সৌরভ লইয়া আজ্ঞাবহের মত চারিদিকে ছুটা-

ছুটি করিতেছে। নৈশকুসুম এক একটী করিয়া কানন মধ্যে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল; শিশুটিও মনের আনন্দে হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল।

শিশুটির সম্মুখে আনাভিশ্মশ্রুজাল বিলম্বিত, চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, দীর্ঘজটাজাল পরিশোভিত, শান্ত প্রকৃতি একটী তাপস মূর্ত্তি করাঞ্জলী-পুটে উপবিষ্ট; ইনি কে? ইনি কি সংসার-সুখে জলাঞ্জলী দিয়া, পরম পিতার পূত পদাশ্রয়ে আশ্রয় লইবার জন্য যোগাসনে বসিয়া আছেন? মরি! মরি! কি শান্ত প্রকৃতি! বাহ্য দৃষ্টি নাই; বাহ্য জ্ঞান নাই; বাহ্য শ্রবণ শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। হায়! যদি বাহ্য শ্রবণশক্তি থাকিত; তাহা হইলে এই নবজাত শিশুর কাতর ক্রন্দন কি যোগীর যোগভঙ্গে সমর্থ হইত না? পাঠক! আপনি যদি যোগীকে দেখিতে ইচ্ছা করেন দেখুন, কেমন চক্ষু মুদিত করিয়া প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন। তিনি ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধিকে বিষয় হইতে দূরীভূত করিয়া জাগরণ স্বপ্ন প্রভৃতি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। হস্ত পদ সমুদায় বিষয় কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছে। দেখুন, কেমন জটাজাল বিলম্বিত, তরু বল্কল পরিধান, ভবতৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীহরির প্রেমতৃষ্ণা প্রার্থনা করিতেছেন। যোগে মগ্ন আছেন বলিয়া কি ইনি শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছেন না? ঐ যে চক্ষুরুন্মিলন করিলেন। অহো! বুঝিয়াছি, যোগীর মনভৃঙ্গ ব্রহ্মপদ কমলের মধু পান করিতে ছিল, কিন্তু শিশুর ক্রন্দনে ব্রহ্মপদ কম্পিত হইতেছে। তাই বুঝি যোগীর মনভৃঙ্গ ব্রহ্ম-পাদপদ্মযুগলে আর বসিতে পারিতেছে না, তাই তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চঞ্চলনেত্রে চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে করিতে সম্মুখে সেই নবজাত শিশুটিকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; একদৃষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ করিয়া মনে মনে ভাবিতে

লাগিলেন ওহো! ইহার প্রস্ফুটিত কমল সদৃশ মুখ কমল দর্শন করিলে, সন্তাপিত ব্যক্তির হৃদয়ও শান্ত হয়। জগতে কে এমন নিষ্ঠুর মানব আছে যে, এমন সন্তানকে কাননে রাখিয়া গিয়াছে? কোন পিশাচী এমন রত্নকে কানন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে? না না সে ত পিশাচী নয়; পিশাচী কি কখন নিজ সন্তানকে কানন মধ্যে ফেলিয়া যায়। তবে সে বাঘিনী, না বাঘিনীরাও ত আপনার সন্তানকে কিছু বলে না, নিজের শাবককে প্রাণপণে রক্ষা করে। জগতে কি এমন নিষ্ঠুরা মানবী আছে, যে নিজের সন্তানকে বধ করিতে উদ্যত হয়? বাঘিনী ও পিশাচী অপেক্ষা নিষ্ঠুরা জীব জগতে আছে কি? সাপিনীরাও ত কই আপনার সন্তানকে ভক্ষণ করে না, কিন্তু এ নিষ্ঠুরা মানবী সাপিনী অপেক্ষাও নির্দ্দয়া। হতভাগ্য! তুই কোন পিশাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি। তোর হতভাগ্য পিতাই বা কোথা? তুইও সামান্য সন্তান নহিস্? তোকে দেখিয়া রাজপুত্র বলিয়া বোধ হইতেছে; তোকে দেখিয়া তোর পিতামাতাকে সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোর পিতামাতাকে ত ইহার জন্য দোষ দিতে পারি না, তবে তোকে কানন মধ্যে কে নিক্ষেপ করিয়াছে? এ আবার কি! অজানুলম্বিত বাহু, প্রশান্ত কপাল, কণ্ঠস্বর সুললিত, বালক! তুই ত সামান্য নহিস্, তবে তুই কে? তোকে কে এই বিজন বিপিনে ফেলিয়া গিয়াছে? তোর মুখ-চন্দ্র দেখিলে, পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়। একে এই জটিল জঙ্গল, তাহাতে আবার চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তুগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। মানবেরও এখানে আসিবার সাধ্য নাই। তরুলতাগণ গগণ স্পর্শ করিবে বলিয়া শাখারূপ হস্ত প্রসারণ করিতেছে। এমন কি প্রভঞ্জনও এখানে স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হয়, এস্থানে কোন্ পাষণ্ড তোকে নিক্ষেপ করিয়া

গিয়াছে? তরুপত্র স্তরে স্তরে সুসজ্জিত করিয়া তোকে কে এখানে স্থাপিত করিয়াছে? জ্ঞান চক্ষু ত আছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, তুই কে আর তোর পিতা মাতাই বা কে? এই বলিয়া যোগী-বর ধ্যানোপবিষ্ট হইলেন। পাঠক? এই শিশুর বৃত্তান্ত আপনারা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন।
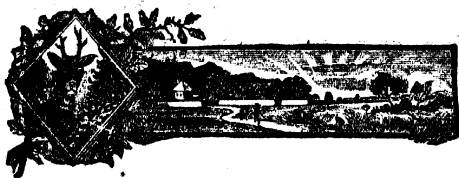
প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণা ভীমসিংহ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম চিরকাল সমভাবে থাকে না। কালবশে সমস্তই বিপরীত হইয়া যায়, কালের এমনি মহিমা; তাহা না হইলে আর্য্য গৌরবের আবাসভূমি রাজপুতনার এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? যাহার শৌর্য্য বীর্য্যে এক কালে বসুধা প্রকম্পিত ছিল, যাহাদের প্রবল পরাক্রমে এককালে যবনগণ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিল, যে আর্য্যজাতির বল বিক্রম সন্দর্শন করিয়া শত্রুগণ দূরে পলায়ন করিত। আজি সেই রাজপুতগণ কোথায় এবং সেই রাজপুতগণের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র রাজপুতনার সে সৌন্দর্য্য কোথায় তিরোহিত হইল? যে রাজপুতগণের অসি শয্যা, ঢাল উপাধান, পরাক্রম ও সাহস নিদ্রা বলিয়া কথিত ছিল, আজি সেই রাজপুতগণের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। রাজপুতগণ! তোমরাই না এক সময়ে সাক্ষাৎ কৃতান্ত মূর্ত্তিধারণ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত যবনগণকে পরাজিত করিয়াছিলে? আবার

তোমরাই না সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, শত্রুর শাণিত অসিতে মস্তক প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতে না? তাই বলিতে হয়, চিরকাল কিছুই সমভাবে থাকে না, কালের চক্রে কিছুই সহ্য হয় না, কাল কাহাকেও সমভাবে রাখিতে পারে না। রাণা ভীমসিংহও এই কালের অপ্রতিহত প্রভাবে পতিত হইয়া লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছেন। এই মহারাণা ভীমসিংহই চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া এককালে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, দীন দুঃখীগণের দুঃখ মোচন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আর্য্যধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল; দেব দ্বিজে অচলা ভক্তি ছিল, পরাক্রমে ভীমসিংহকে দ্বিতীয় ভীম বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। দুর্ব্বলের প্রতি অভয়দান ও প্রবলের প্রতি বল প্রয়োগ তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ গুণ ছিল। মহারাণা ভীমসিংহ এত সদ্‌গুণের আধার হইলেও একটী মহান্ অভাব তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ বিমনা হইয়া থাকিতেন। এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তাহার মন বিষাদ ভরা ছিল। মন কখন চিন্তা ছাড়া থাকিতে পারে না, যত দিন মন ততদিন চিন্তা। রাণা ভীমসিংহের কিছুরই অভাব ছিল না, কেবল সংসারের সার, প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধন পুত্রধনে বঞ্চিত ছিলেন। এই অভাব তাঁহার জীবনে একটী মহা অভাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই অভাবজনিত দুঃখে তিনি সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেন "আমি কি নরাধম, আমার ভীমসিংহ নাম কখন রাণা সম্ভাষণের উপযুক্ত নয়। ধিক আমাকে আমি মহাপাপী, আমা হইতে বুঝি পিতৃপুরুষের জল-গণ্ডুষ পর্য্যন্ত লোপ হয়। হা স্বর্গীয় পিতঃ! হা মাতঃ! তোমাদের কুলাঙ্গার সন্তান ভীমসিংহ হইতে বুঝি পরম পবিত্র রাণাবংশের উচ্ছেদ হইল

যায়। প্রিয়তমা সুশীলা কেবলমাত্র পুত্ররত্ন লাভের জন্য সর্ব্বদা শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়াকলাপে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু হা জগদীশ! ইহাতেও কি তোমার অপার দয়া-সাগরের কণিকা মাত্র লাভ করিতে সক্ষম হইব না? এই দুর্ব্বিসহ মনঃদুঃখে আর কত কাল আমাদিগকে দগ্ধ করিবে? সাধ্বীর প্রতি কৃপা কর দয়াময়! ভীমসিংহ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একেবারেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কিছুই যেন তাঁহার ভাল লাগিল না, সমস্তই যেন তাঁহার চক্ষুশূল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক দুশ্চিন্তা যাহার হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তিনি মহাজ্ঞানী হইলেও সময়ে সময়ে এইরূপ দিশাহারা হইয়া থাকেন, মানব মনের রহস্যই এইরূপ। পুত্র না থাকিলে বাস্তবিক সংসারের যেন কোন শোভাই থাকে না। পুত্রই যে সংসারের শোভা, সংসারের মহাধন। তবে সৎপুত্র হওয়া চাই, সৎপুত্র হইলে পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল ও বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়।

এদিকে বেলা অধিক হইতে লাগিল। ভীমসিংহ আর কাল বিলম্ব না করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নিজ প্রণয়-প্রতিমা জীবন-সঙ্গিনী সুশীলার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি বিষাদিনী বেশে ধূল্যবলুণ্ঠিতা, গাত্রের অলঙ্কার সকল খুলিয়া ফেলিয়াছেন; যেন রাহু গ্রাসিত চন্দ্রমা ভূতলে শোভা পাইতেছে। ভীমসিংহ প্রিয়ার এতাদৃশ অবস্থান্তর দেখিয়া বিষাদিত চিত্তে গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন— "প্রাণাধিকে সুশীলে! একি প্রিয়ে! তুমি চিতোরের রাজমহিষী হইয়া সামান্য লোকের মত এত অধৈর্য্য হইলে চলিবে কেন?" রাজমহিষী সুশীলার প্রাণে একটা নিরানন্দ বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বৃক্ষ থাকিতে ফল ফলিল না; স্বামী স্ত্রী উভয়ে বর্ত্তমান থাকিতে

তাহাদের পুত্র হইল না; তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে দত্তক লইয়া কার্য্য করিতে হইবে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সাধ্বী সুশীলা জানিতেন ইহা দৈবাধীন, এই জন্য এখন হইতে তিনি দৈব কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কারাদির প্রতি এখন আর তাঁহার আস্থা নাই। রাজমহিষী সুশীলা নিজ পতিকে পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে নিরুদ্বিগ্ন করিবার জন্য মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"নাথ! শরীর অত্যন্ত তাপিত হইয়াছে বলিয়া ক্ষণকাল মৃত্তিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম; যদি তাহাতে এই দগ্ধ, দেহ কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়।" ভীমসিংহ প্রিয়তমাকে ঘোর বিষাদ-সাগরে নিমগ্না দর্শন করিয়া বলিলেন—"প্রিয়তমে! সমস্তই বিধাতার লীলা, তিনি যাহার ভাগ্য যেরূপ গঠন করিয়াছেন, সেইরূপই হইবে; তাহার অন্যথা হইবার নহে; বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। পূর্ব্বজন্মে আমরা কত মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাই ইহজন্মে পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়াছি ইহাতে মানবের কোন হাত নাই। তবে মানুষ যাহা করে, যাহা করিতে মানবের ক্ষমতা আছে; সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। দেব দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা কর; দৈবকার্য্যে সকলেই সম্ভব হইতে পারে তাই শাস্ত্রে বলে "নচ দৈবাৎ পরং বলং"। কায়মনে ব্রাহ্মণের সেবা করিবে, কারণ ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণের সেবা করিলে তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না। প্রিয়ে! আমাদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্তই যেন বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে; রাজকীয় কোনও বস্তু যেন আর ভাল লাগে না। পুত্ররত্ন বিনা সকলই বিফল। আমার অন্তঃকরণও আজ কয়দিন ধরিয়া অপুত্রতা-জনিত দুঃখে যার পর নাই কাতর হইয়াছে; কিন্তু কি করিব প্রিয়ে! অদৃষ্টের প্রতীকার করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে।" ভীমসিংহ এইরূপ নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রিয়াকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

লীলাময়ের লীলা বুঝা ভার। এই জগতে কত নর নারী, পুত্র হইল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে; আবার কত লোক বহু পুত্র লাভ করিয়া আহার দিতে না পারিয়া ঘোরতর মর্ম্ম যাতনা ভোগ করিতেছে। ইহা "দিল্লিকা লাড্ডু" যে খাইয়াছে সে ও যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আর যে না খাইয়াছে তাহার ত কথাই নাই; তাহারও যন্ত্রণার একশেষ। এই জন্যই বলিতে হয় একাধারে সকল সুখ জগতে কাহারও ভাগ্যে হয় না। ভগবান কাহাকেও সর্ব্ববিধ সুখদানে পুরস্কৃত করেন না। আসমুদ্র—করগ্রাহী সম্রাট হইতে সামান্য দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত কেহ কখন সম্যকরূপে সুখী হইতে পারে নাই। জগতের যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর, একটী না একটী মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার অন্তঃস্থল দগ্ধ হইতেছে। মহারাণা ভীমসিংহ অতুল ধনের অধিপতি হইয়াও জগতের শোক দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তাঁহারও হৃদয় সর্ব্বদা অপুত্রতা-জনিত দুঃখে পুড়িয়া যাইত। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, আহার বিহারে, কিসে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইব, এই চিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এই প্রকারে কিছুদিন গত হইলে একদিন ভীমসিংহ পতিপ্রাণা সুশীলা সমভিব্যাহারে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। যামিনী শেষে তিনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে; ভীষণ কৃতান্ত দূত সকল আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতেছে। ভীমসিংহ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কিন্তু চিৎকার করিতে পারিলেন না, কে যেন তাঁহার মুখ বন্ধন করিয়াছে; তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় যম-কিঙ্করগণ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া যমালয়ে উপনীত হইল। সম্মুখে বৈতরণী নদী প্রবাহিত হইতেছে—তাহাতে শোণিত, মাংস,

কৃমি সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার দানশক্তি প্রবল নহে, সে বৈতরণী পার হইতে পারে না। ভীমসিংহের দানশক্তি প্রবল ছিল, এই নদী পার হইতে তাঁহার কোন কষ্ট হইল না, অকাতরে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিলেন। পরে পুন্নাম-নরক সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন পাপীগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে, নরকের ভীষণ কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। ভীমসিংহ এইবার দিশাহারা হইলেন, আর তাঁহার পরিত্রাণের উপায় নাই; পুত্র নাই যে, পিণ্ডদ্বারে তাঁহাকে এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে। প্রবল পরাক্রান্ত রাণা ভীমসিংহের অন্তরও এইবার ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে নরক মধ্যে পড়িয়া গেলেন, রক্তপিপাসু কীট সকল তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল, দুর্গন্ধে প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু দেহ হইতে বহির্গত হইল না। যম-দূতগণের মুদ্গরাঘাতে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল। তিনি ভয় বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনি পতিপ্রাণা সুশীলা শশব্যস্তে ভীমসিংহের গাত্রে হস্ত দিয়া দেখিলেন, তিনি থর থর কাঁপিতেছেন, ভয়ে কথা কহিতে পারিতেছেন না। সুশীলা স্বামীকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নাথ! আজ কেন এমন করিতেছেন, সহসাই বা নিদ্রাভঙ্গ হইল কেন? দাসীকে সবিশেষ জ্ঞাত করিয়া সুখী করুন।" স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পাছে, সুশীলার সরল হৃদয়ে ব্যথা লাগে, এই ভয়ে ভীমসিংহ অন্য নানাপ্রকার কথায় পত্নীকে বুঝাইয়া দিলেন। ভীমসিংহ আপন প্রণয়িনী সুশীলাকে এক প্রকার বুঝাইলেন বটে, কিন্তু গত রজনীর সেই দারুণ দুঃস্বপ্ন তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিয়া, চিন্তানলে সতত শরীরদগ্ধ করিতে লাগিল। রাজত্ব আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। সমস্তই যেন তাঁহার চক্ষুঃশূল বলিয়া

বোধ হইতেছে। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর কেন বৃথা আমার আমার করিয়া অমূল্য জীবন অতিবাহিত করি, কাহার নিমিত্ত আর ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করি? কেই বা ইহা ভোগ করিবে? এখন অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর সেবায় কাটাইতে পারিলেও পরকালে নিস্তার হইবে। এখন যেদিকে দুই চক্ষু যাইবে সেইদিকে চলিয়া যাইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুশীলার চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। যে সুশীলা আমাগত-প্রাণা, আমাভিন্ন জগতে যে আর কোন বস্তুই জানে না, কোন্ প্রাণে তাহাকে একাকিনী রাখিয়া গমন করিব? এইরূপ একটীর পর একটী তার পর আর একটী করিয়া নানাপ্রকার চিন্তায় তাঁহাকে কাতর করিতে লাগিল।

ক্রমে বিবস্বান্ মহারাণার কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। অন্ধকার রূপ কৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া রজনী দেবী ধরা মাঝে অবতীর্ণা হইলে, ভীমসিংহ মনে করিলেন, এইত সময়; এই সময় অভিলাষিত স্থানে গমন করাই বিধেয়। এই বলিয়া বিচিত্র কারুকার্য্য সম্বলিত রাজ-পরিচ্ছদ খুলিয়া বিভূতি ভূষণে দেহ অলঙ্কৃত করিলেন; গলদেশে বহুমূল্য মুক্তামালার পরিবর্ত্তে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন। মহারাণার এই বেশ দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাত্মা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে দগ্ধীভূত হইয়া, মুক্তি লাভের জন্য সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, পরকাল—নিস্তার—কর্ত্রী পতিতোদ্ধারিণী ভাগিরথী তীরে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ, জীব জন্তু সকলেই সুষুপ্ত, সকলেই নিদ্রার

কোমল ক্রোড়ে শায়িত। এমন সময়ে ভীমসিংহ শান্তিলাভ আশয়ে গৃহ হইতে একাকী বহির্গত হইলেন।
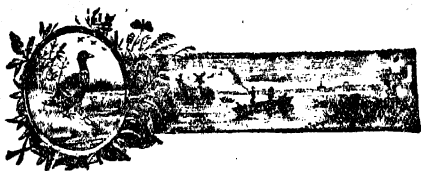
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌবনে বৈরাগ্য।

মনই দেহ রাজ্যের রাজা। ইহা কখন্ যে কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা বলিতে পারা যায় না। মানব মনের তুল্য রহস্য আর কিছুই নাই।

কোথায় রাজা আর কোথায় ভিখারী, ভীমসিংহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ চলিতে লাগিলেন; দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া, মাসান্তে সমুদ্র তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার অপ্রতিহত গতির প্রতিরোধ হইল, ভীমসিংহ সমুদ্র তীরে আসিয়া যেন হতবুদ্ধি হইলেন। আর যাইবার পথ নাই—সম্মুখে সমুদ্র, পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালায় মণ্ডিত হইয়া, বিপুল বিক্রমে নৃত্য করিতেছে। তাহার তাণ্ডব নৃত্যে কুল ভূমি ভীষণ বেগে বিতাড়িত হইয়া স্থানে স্থানে ভগ্ন হইতেছে।

মধ্যে মধ্যে চক্রাকার আবর্ত্ত সকল যেন সমুদ্র-সলিল মন্থন করিয়া বর্ত্তুলাকারে পাতালাভিমুখে গমন করিতেছে। সেই মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তরঙ্গসমূহের ভীষণ শব্দ, শ্রবণ করিলে কর্ণ বধির হইয়া যায়; কাল্পনিকগণের চক্ষে ইহা কল্পনার ভাণ্ডার। তরঙ্গগুলি যেন আপন হস্ত প্রসারণ করিয়া জল দেবীর চরণপদ্মে বুদ্বুদ-কুসুম উপহার দিতেছে। সূর্য্যরশ্মি জলধিবক্ষে পতিত হইয়া আ মরি! মরি! কি সুন্দর শোভাই ধারণ করিয়াছে, যেন অমূল্য হীরক-খচিত হেম-হার পরিধান করিয়া সমুদ্র আপন মনে উধাও হইয়া চলিয়াছে।

ভীমসিংহ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে আপনা-আপনি বলিলেন, হায়! এইত জলধি, এইত অকূল পারাবার, মকর হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি জল জন্তুগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। বিচক্ষণ নাবিকের সাহায্য পাইলেই এই সমুদ্র অনায়াসে পার হওয়া যায়। কিন্তু আমার এই জীবন-জলধি পার হইবার উপায় কি? সংসারের নানাবিভীষিকারূপ তরঙ্গসমূহ অহঃরহ আমাকে সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ আমাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে, এসময় তিতীক্ষা তরণীতে আরোহন পূর্ব্বক হরিনাম নাবিকের সাহার্য্য ব্যতীত উদ্ধা-রের আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। মুনি ঋষিগণ বলিয়াছেন, জীবন-জলধি পার হইবার এমন সহজ পন্থা আর নাই। তবে আমি আর নিশ্চেষ্ট হইয়া এখানে বসিয়া কেন? যাই বিজন বিপিনে ভগবদ্ভক্ত যোগীগণের দর্শন লাভ করিয়া মানব জীবন সার্থক করি; তাঁহারা লোকালয় ছাড়িয়া নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিতেছেন, যদি কোনক্রমে তাঁহাদের কৃপা কটাক্ষ লাভ করিতে পারি, তবে

আর কোন চিন্তাই থাকিবে না। আমাকে আর এতাদৃশ মর্ম্মযাতনায় জ্বালাতন হইতে হইবে না,—সমস্ত যাতনা, সমস্ত ক্লেশ একেবারে নির্ব্বাণ হইবে।

এই বলিয়া মহারাণা ভীমসিংহ গাত্রোত্থান করিয়া অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যতদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হয়, ততদিন মানব কিছুই করিতে পারে না। আশার আশ্বাসে তাহারা ইতঃস্তত করে বটে, কিন্তু সে সমস্তই বৃথা, ভাগ্য প্রসন্ন না হইলে যাহাই কর, কিছুতেই ফলোদয় হইবে না, অদৃষ্টই সকলের মূলাধার।

ভীমসিংহ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটী মনোহর তপোবন দেখিতে পাইলেন। যেন স্বয়ং শান্তি দেবী আপন মূর্ত্তিধারণ করিয়া তপোবনের সমস্ত প্রাণীগণকে শান্তি বিতরণ করিতেছেন। মরি মরি কি মনোহর স্থান! ভীমসিংহ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই যোগী-জন-নিসেবিত শান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিয়া যেন সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন।

দিবা দ্বিপ্রহর, মৃগশাবকগণ প্রখর রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভার্থ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে। পক্ষীগণ নিজ নিজ কুলায় বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। ইহা শ্রবণ করিলে, তপোবনের এই হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত ভাব দর্শন করিলে, মন যেন উদাস হইয়া যায়, প্রাণে যেন স্বভাবতঃই ভগবানের অভাবনীয় মহিমার কথা জাগিয়া উঠে। মনে হয়, ইহাই বুঝি স্বর্গ; যেখানে আত্মপর ভেদাভেদ নাই, তাহাই ত স্বর্গ। পাঠক! যদি স্বর্গ লাভ করিতে চাও, তবে এইস্থানে আইস এই স্থানের লোক সকলের ন্যায় হৃদয় পবিত্র কর। যেস্থানে লোক

হিতকারী সাধুগণ অবস্থিতি করেন, যেখানে মানব ও হিংস্রজন্তু হিংসা ছাড়িয়া একত্রে বাস করে, যেখানে সমস্ত একাকার, যেখানে ভক্তের হৃদয় হইতে সতত ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, যেখানে প্রেমোন্মত্ত যোগীগণ কর্ত্তৃক ভগবন্নাম কীর্ত্তন হয়, সেই ত ভগবানের প্রিয় স্থান। ভগবান ত নিজেই ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদকে বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" হরি! হরি! এমন স্থান কি আর আছে? ভীমসিংহ! তুমি এতদিন পরে প্রকৃত স্থানেই আসিয়াছ। এই স্থানে তোমার সমস্ত যাতনা, সমস্ত মনোবেদনা দূরীভূত হইবে। যাহার জন্য তুমি সংসার ছাড়িয়াছ, অচিরেই তোমার সে বাসনা পূর্ণ হইবে, তুমি চরিতার্থতা লাভ করিবে।

ভীমসিংহ যদিও এই শান্তিময় তপোবনে আসিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে এখনও শেষ রজনী-দৃষ্ট স্বপ্নবৃত্তান্ত তিরোহিত হয় নাই। অনুক্ষণ তাহা মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতেছে। অপুত্রক হইয়া সংসারে বাস করা অপেক্ষা বিজন-বিপিনে বাস করা ভাল, সংসারে আর তাঁহার স্পৃহা নাই, এই জন্যই তাঁহার এই নবীন যৌবনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে পরিশ্রম করিয়া দেহ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল; ভীমসিংহ আর ভ্রমণ করিতে না পারিয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার মন অত্যন্ত কাতর হইতে লাগিল, মনে করিতে লাগিলেন, কই! শান্তিময় তপোবনেত কোন মহাত্মার সাক্ষাৎ পাইলাম না, তবে আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই? জগদীশ! এ পাপাত্মার কি তবে সদ্গতি হইবে না? পাঠক! দেখুন, যিনি চিতোরের

অধীশ্বর, অসংখ্য দাস দাসী যাঁহার সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল। সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাহার নিদ্রা হইত না, আজ তাহার কি গতি হইয়াছে, একবার দর্শন করুন, তাই বলিতে ছিলাম, মানবমন রহস্যের ভাণ্ডার। মন উদাসভাবাপন্ন হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মহারাণার এই দশা। ইহা কি মন্দ, এ দশা কি ঘৃণিত? না, তাহা নহে; এই দশাই দুর্দ্দশানাশের প্রকৃত পন্থা।

মহারাণা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে সৌম্য-মূর্ত্তি, আপৃষ্ঠ-জটাজাল-বিলম্বিত, শ্বেত-শ্মশ্রুধারী এক যোগীর দর্শন লাভ করিলেন। আহা, কি শান্তমূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎ যোগীবর মহাদেব মহারাণার প্রতি সদয় হইয়া তপোবনে আগমন করিয়াছেন।

এতক্ষণ পরে ভীমসিংহের আশা পূর্ণ হইল। যোগীবরের দর্শন পাইয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে চরণপ্রান্তে প্রণাম করিলেন। যোগীঋষিগণ ক্ষমা ও দয়ার নিদান। রাজাকে প্রণত হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! কে তুমি? তোমাকে দেখিয়া কোন উচ্চ বংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে, কোন চিন্তা নাই, আত্মপরিচয় প্রদান কর।"

ভীমসিংহ যোগীবরের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—' প্রভু! আমি ঘোর নারকী, নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কাননবাসী হইয়াছি। দেব! আপনার শ্রীচরণ কৃপায় আমার কিছুরই অভাব নাই, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই আছে, কেবল অপুত্রতা নিবন্ধন আমার সমস্ত সুখই অসুখের হেতু হইয়াছে।" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

যোগীবর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"বৎস! একার্য্য তোমার ন্যায় বিবেচক রাজার উচিত হয় নাই। পুত্র নাই বলিয়া রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নয়। একমাত্র পুত্র নাই বলিয়া কোটী কোটী পুত্রকে কাঁদান রাজার উচিত নয়। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি সংসারী, সংসারের তুল্য স্থান আর নাই, ইহাতে ভোগ মোক্ষ দুই লাভ হয়, তবে বৎস! বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কেন পরকাল হারাইতেছ? আর তুমি যাহার হৃদয়ের মণি, মানসের দেবতা, শয়নের নিদ্রা, যন্ত্রণার শান্তি, ক্ষুধার আহার, পিপাসার জল, তোমা বিহনে তাহার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে একবার ভাব দেখি? ভাব দেখি, তোমার প্রণয়িনী তোমার অভাবে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। বৎস! এ সকল কি পাপ নয়, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন কি রাজার ধর্ম্ম নয়? নিজ রাজ্ঞীর মনোকষ্ট ও প্রজাপুঞ্জের দারুণ যন্ত্রণা কি তোমার মুক্তিপথের কন্টক হইবে না? তোমার উপর রাজ্যপালনের গুরুতর ভার সমুহ অর্পিত হইয়াছে, তুমি এ সকল কিরূপে অবহেলা করিতেছ? অতএব স্বরাজ্যে গমন করিয়া পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন কর, তাহা হইলে তোমার সদ্গতি হইবে।"

ভীম। প্রভো! যখন আমাকে অপুত্রতা হেতু পুন্নাম নরকে গমন করিতে হইবে; তখন কি প্রজাগণ এবং আমার সহধর্ম্মিণী সে যন্ত্রণা হইতে আমায় উদ্ধার করিবে? প্রভো গৃহবহির্গমনের শেষরজনীদৃষ্ট নিদারুণ স্বপ্নের কথা মনে হইলে, এখনও প্রাণ শিহরিয়া উঠে; আর রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হয় না।

যোগীবর রাণার ভাব দেখিয়া বলিলেন "বৎস! স্বপ্ন অমূলক ভ্রান্তিমাত্র, স্বপ্ন কখন সত্য হয় না, তবে কেন বৃথা সে বিষয় চিন্তা করিয়া আত্মাকে কষ্ট প্রদান করিতেছ? পুত্র নাই বলিয়া সংসার পরিত্যাগ

করিলেই কি নরক যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইবে? বৎস! সংসারের ন্যায় কল্যাণ-প্রদ স্থান আর নাই, সেই জন্য শাস্ত্রবেত্তারা সংসার-ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সার বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যোগীশ্রেষ্ঠ জনক রাজা এই সংসারে থাকিয়াই রাজর্ষি হইয়াছিলেন। ভগবানে অচলা ভক্তি থাকিলে সংসারেই মানবগণ অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারে।" ভীমসিংহ যোগীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "দেব! আপনার বাক্য আমি যার পর নাই আশ্বস্ত হইয়াছি, কিন্তু প্রবল স্রোত যখন সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়; প্রভু! মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না।"

যোগীবর মহারাণার প্রতি, পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাকে আর কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া বলিলেন, 'বৎস! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আর অন্যমত করিও না, এখনি রাজ্যে গমন কর আমার বরে অচিরেই পুত্ররত্ন লাভ করিবে কিন্তু দেব-দ্বিজে স্থির বিশ্বাস করিও, প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিও, বৃথা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইও না।" এই কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিয়া যোগী অন্তর্হিত হইলেন, ভীমসিংহ অবাক হইয়া রহিলেন, আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, রাণার আর আনন্দের সীমা নাই, পুলকিত চিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, কানন হইতে বাহির হইলেন। রাজা যদি প্রজাবৎসল হন, তাহা হইলে রাজার আনন্দে প্রজার আনন্দ, রাজার সুখে প্রজার সুখ, রাজা দুর্বৃত্ত হইলে প্রজারা তাহার সুখে সুখী হয় না। পাঠক! প্রজাবৎসল ভীমসিংহের এই সুসংবাদে আপনারা মঙ্গলময়ের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করুন।
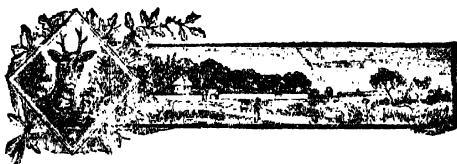
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ উদ্যান।

মহারাণা প্রফুল্লমনে কানন হইতে বাহির হইয়া, ক্রমশঃ স্বীয় রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনের আবেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে, ঋষিবাক্যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ভ্রান্তিমূলক স্বপ্নচিন্তা আর তাহাকে যাতনা দিতে পারিতেছে না।

বেলা প্রায় সায়াহ্নের সমীপবর্ত্তী, বিবস্বান পশ্চিমাকাশের নিম্নভাগে ঢলিয়া পড়িয়া, ক্রীড়াশীল বালকের ন্যায় লালরঙ্গের মেঘের সহিত খেলা করিতেছে, তাহার সমুজ্জ্বল হাসি এখন আর সমতলভূমি ও নিম্নভূমি সকল দেখিতে পাইতেছে না, বৃক্ষচূড়া প্রভৃতি উন্নত অবস্থাপন্ন পদার্থপুঞ্জই অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় হাস্য সন্দর্শন করিতেছে, আর বেলা নাই দেখিয়া কৃষকগণ হলস্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছে, পক্ষীগণ দিবসের পরিশ্রম শেষ করিয়া স্বাধীনভাবে আপন আপন কুলায় আসিয়া বিশ্রামসুখানুভব করিতেছে।

ভীমসিংহ সমস্ত দিবস পথভ্রমণ জন্য সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী একটী মনোহর উদ্যান দেখিয়া বিশ্রামাশয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, উদ্যানটী অতি রমণীয়ভাবে সজ্জিত; যেন ধনীগণের সজ্জিত প্রমোদ কানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদ্যানের সম্মুখে একটী স্বচ্ছ সরোবর, সোপানাবলী অতীব পরিস্কার, দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রত্যহ লোকজন সমাগমে এইরূপ শ্রীধারণ করিয়াছে। উদ্যানের উত্তর দিকে একটী দেবালয়, চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, কেবল দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার ও পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ গমনাগমনের দ্বার সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রাচীরের চারিধারে নানা-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ সকল রোপিত হইয়া শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, পূর্ব্বদিকে উদ্যানের বাহিরে সুবৃহৎ অট্টালিকা কোন রাজভবন বলিয়া অনুমিত হয়। ভীমসিংহ বহুদিনের পর লোকালয় দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত ও আনন্দিত হইলেন এবং সে দিবস তথায় অবস্থান করিবার মানসে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে সরোবরে অবতরণ করিলেন এবং হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে একটী বকুলবৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইল, রজনীদেবী আলোক মালায় মণ্ডিত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্য সকল বাজিতে লাগিল। উদ্যানস্থিত দেবালয়েও আরতির বাদ্যাদি বাজিতে লাগিল। আর কথিত অট্টালিকা হইতে রমণীগণ মহামায়ার আরতি দর্শনে দেব ভবনে সমাগত হইলেন।

হিন্দুরমণীর ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রগাঢ়, দেবতার নামে তাহারা গলিয়া যায়, দেবতাদের প্রতি তাহাদের ভক্তি অচলা। ধর্ম্মভাব এখন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি যাহা আছে, তাহা হিন্দু রমণীগণের মধ্যেই

দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বঙ্গদেশে যে ধর্ম্ম আছে এবং থাকিবে, তাহা কেবল পুণ্যপ্রতিমা, আরামদায়িনী বঙ্গ-কামিনীগণের দেব-ভক্তিগুণে।

আরতি শেষ হইল, সকলেই গললগ্নীকৃতবাসে দেবীচরণে প্রণিপাত করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। কেহবা জ্যোৎস্নালোকে উদ্যান মধ্যে পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। এ উদ্যানে পরপুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, তজ্জন্য রমণীগণ স্বাধীনভাবে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতেছে। যাহারা পুষ্প আহরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একটীর বয়স অনুমান পঞ্চদশবর্ষ, হিন্দুর বিবাহ-চিহ্নস্বরূপ সিমন্তে সীন্দুর-বিন্দু নাই বলিয়া অনুমান হয়, এখনও সুন্দরীর বিবাহ হয় নাই, সঙ্গে দুই সঙ্গিনী। যুবতীর রূপের তুলনা নাই, এরূপ রূপ আঁকিবার নয়, রমণীর লাবণ্য লীলাবারিতে ভুজদ্বয় মৃণাল সদৃশ শোভা পাইতেছে, সে বাহুযুগলের তুলনা নাই, তাই ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "পদ্মনাভী পদ্মনালে ভাল গড়ে ছিল, ভুজ দেখি কাঁটাদিয়া জলে ডুবাইল"; করতল রক্তিমাভ, যেন মৃণালোপরে প্রস্ফুটিত পঙ্কজ, তাহাতে চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলীমূলে বহুমূল্য হীরকখচিত অঙ্গুরী! ইহাতে রমণীর রমণীয়তা যেন আরও বৃদ্ধি করিতেছে। বয়সানুযায়ী নিতম্বদেশ প্রশস্ত। মুখের তুলনা নাই, রজনীনাথ চন্দ্র দেবও যেন এই মুখের নিকট হীনপ্রভ ও লজ্জিত, এক কথায় রমণী সকল সৌন্দর্য্যের আকর এবং সম্প্রতি যৌবনসীমায় পদার্পণ করায় রূপের মধুরিমা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এ রূপ দেখিলে মন ও নয়নের সার্থকতা সম্পাদন হয়, হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, এই রূপই সংসারীগণের কাম্যবস্তু, যোগীগণের পরীক্ষার স্থল। রমণীত্রয় পদচারণা করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের পূর্ব্বকথিত বকুলবৃক্ষতলে—যথায় মহারাণা বসিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া উপনীতা হইলেন। ভীমসিংহ বড়ই বিব্রত

হইলেন, মনে করিলেন এই রমণীগণ-নিষেবিত উদ্যানে প্রবেশ করা ভাল হয় নাই; ইহা নিশ্চয়ই কোন রাজার প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান হইবে, রমণী-গণের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, নতুবা একটীও পুরুষের দর্শন পাইতেছি না কেন? কিন্তু কি করিবেন, এখন ত আর বাহির হইবার উপায় নাই, একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে রাত্রিকাল, কি করিবেন, সাহসে ভর করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সখীগণ সমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে হঠাৎ সেই-দিকে যুবতীর নয়ন পতিত হইল, একেবারে চারিচক্ষু একত্রে মিলিত হইল। অবধূতবেশধারী মহারাণার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যুবতী যার-পর-নাই বিমোহিতা হইলেন। অমনি রমণীসুলভ লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, পুষ্পচয়ন করা হইল না। রমণী অধো-বদনে কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যাহার যে বিষয়ের অভাব, তিনি সেই কাম্যবস্তু সম্মুখে দেখিতে পাইলে যে, কত আনন্দিত হন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য কিন্তু নারীজাতির যে পদে পদে বিপদ। যুবতীর মনে আনন্দ ও ভয় যুগপৎ সমুদিত হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

তিনি আপন সখিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মালতি! রাত্রি অধিক হইয়াছে, বোধ হয় মা আমাদের জন্য এখনি লোক পাঠাইবেন, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই, চল্ গৃহে যাই।

মালতী অল্পবয়সে বিধবা, তাহার যৌবনের একটানা প্রণয়স্রোতে হৃদয় পূর্ণ হইতে না হইতেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন সে বড় ফচুয়া; হাসি, তামাসা, কৌতুক লইয়াই সর্ব্বদা থাকে। আপন সহচরীর কথা শুনিয়া বলিল,—"সখি, আর কি যাইবার যো আছে, একটু

অপেক্ষা কর।” এই বলিয়া মালতী অগ্রসর হইয়া অবধুত বেশধারী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“মহাশয়! আপনি কে, কি নিমিত্তই বা গুপ্তভাবে এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছেন? এখানে রমণী ব্যতীত কাহার প্রবেশের অধিকার নাই, আপনি কোন্ সাহসে উদ্যান মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন? আপনাকে দেখিয়া কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, যথা-যথ আত্মপরিচয় দানে কৃতার্থ করুন।”

ভীমসিংহ সেই অনিন্দ্যকান্তি, সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীকে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, পূর্ব্বপত্নী সুশীলার প্রণয় ক্ষণেকের জন্ম বিস্মৃত হইলেন, কেমন করিয়া ঐ একমাত্র ললামভূতা রমণীকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই চিন্তা করিতে ছিলেন। এক্ষণে মালতীর নিকট জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—“অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, এক্ষণে আমার অন্য পরিচয় কিছুই নাই, অবধুতবেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করাই আমার কার্য্য। এস্থানে যে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই, তাহা আমি সম্যক্ অনভিজ্ঞ, তবে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আপনাদের উদ্যানে আশ্রয় লইয়াছি, যদি কোন বাধা থাকে, অনুমতি করিলে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।” কমলপ্রিয়-দিনকর মনোদুঃখে তেজোহীন হইয়া অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে পর, রজনীদেবীর আগমন কালে বিজয়-কাননে থাকা অসম্ভব বুঝিয়া লোকালয়ে অতিথি হইবার মানসে এই দেবালয় সংস্থাপিত মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট মন্দবশতঃ এই পুরুষ প্রবেশানাধিকারস্থানে প্রবেশ করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক অনধিকার প্রবেশবশতঃ আমার দোষ ক্ষমা করিবেন, আমি এই রমণী-নিষেবিত উদ্যান মধ্যে থাকিতে কামনা করি না, অনুমতি করিলে এখনি এ স্থান হইতে অন্যত্র গমন করি।

মালতী পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"মহাত্মন্! গৃহে অতিথি আসিলে গৃহস্থ কি তাহাকে বিতাড়িত করে? আমাদের সখি বোম্বাই রাজের একমাত্র দুহিতা, নাম পদ্মাবতী রমণীকুলের আদর্শ, তিনি আপনার পরিচয় জানিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন. যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।" রমণী হৃদয় কি সুন্দর জিনিষ, যাহা একবার অঙ্কিত হয়, তাহা সহজে অপসারিত হইবার নয়। রাজকুমারী পদ্মাবতী মহারাণার রূপসাগরে যেন ডুবিয়া গিয়াছেন. আর যেন তাঁহার গৃহে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। পদ হইতে পদান্তরে যাইতে যেন অশক্ত। একবার মনে করিতেছেন,—আমি কি করিতেছি, অজ্ঞাতকুলশীল এই যুবককে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ এত অধৈর্য্য হইতেছে কেন, আবার মনে করিতেছেন, না, এ রূপরাশি কখন নীচকুলে সম্ভবে না,—ইনি নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্র, অভাগিনী পদ্মাবতীর হৃদয়ের ধন, এতদিন পরে বিধাতা বুঝি দাসীর প্রতি সদয় হইয়াছেন।

প্রণয়ের সম্মিলন কি চমৎকার, কাহার মুখে কোন কথা নাই, অথচ হৃদয়ের মধ্যে যে আন্দোলন হইতেছে, চাপিয়া রাখা বড়ই কষ্টকর। উদ্যান নিস্তব্ধ, সময়ে সময়ে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের পতনশব্দ ও রাত্রিচর পক্ষীগণের পক্ষশব্দ শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কে ডাকিল,—"মা পদ্মাবতি! এখন কি আরতি শেষ হয় নাই, রাত্রি যে অনেক হয়েছে মা, আর পুষ্পচয়ন করিয়া কাজ নাই।"

পদ্মাবতী চমকিত হইলেন। এই সুখের সময় জননীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণভাবে অথচ ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন,—"মালতি! শীঘ্র চল, ঐ বুঝি মা আসিতেছেন।" এই বলিয়া দ্রুতপদে সকলে

অন্যদিক দিয়া প্রস্থান করিল। ভীমসিংহ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে রাজ্ঞী পদ্মাবতীকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বৃক্ষতলে মহারাণাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি! রাজান্তঃপুরস্থিতঃ উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়াছ, তোমার কি মৃত্যুর ভয় নাই?"

যাহার হৃদয়ে কোন পাপ নাই, তাহার ভয় কোথায়? ভীমসিংহ বাস্তবিক কোন অসদভিপ্রায়ে উদ্যানে প্রবেশ করেন নাই তিনি বলিলেন—জননি! আমি কোন দস্যু বা পাপাচারী নই সন্ধ্যা-সমাগমে অনন্যোপায় হইয়া এস্থানে আসিয়াছি, এবং ইহা যে অন্তঃ-পুরস্থিত উদ্যান তাহা জানিতাম না।"

স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ অতি কোমল, দয়া ও মায়ার আধার, রাজ্ঞী রাণার শান্ত স্বভাব ও সুমিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট হইয়া অভয় দানসূচক বাক্যে বলিলেন,—"বৎস! যদি তুমি যথার্থই রাত্রিযাপন মানসে এখানে আসিয়া থাক, যদি তুমি যথার্থই অনন্যোপায় হইয়া থাক তবে আর উদ্যানে অবস্থান করিয়া কাজ নাই, আমার সহিত আইস।"—এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন। ভীমসিংহ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজ্ঞীর সহিত রাজবাটীতে গমন করিলেন। পূর্ব্বে অতিথি বলিলেই লোকের মনে কেমন একটা ধর্ম্মভাব উপস্থিত হইত, এক্ষণে কিন্তু সেরূপ আচার ব্যবহার নাই, একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ভীমসিংহ রাজ্ঞীর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখ-বিভাবরী।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, চারিদিক নিস্তব্ধ। সকলেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে শায়িত। চকোর নীরবে কেবল আপন মনে চন্দ্রমার কিরণ সুধা পানে বিব্রত। রজনী ঘোষি প্রহরীগণের কলরবে ও পেচকের কর্কশস্বরে সময়ে সময়ে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। আপনাদের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখাইয়া তারাগণকে উপহাস করিবার জন্য যেন খদ্যোতকুল বৃক্ষপত্রে সমবেত হইয়াছে, বৃক্ষ যেন মণিমাণিক্যে ভূষিত হইয়া আপন শোভার অহঙ্কার করিতেছে। কিন্তু দেখে কে? এ ঘোর নিশীথেত কেহই জাগরিত নাই, জীব জন্তুগণ দিবসের পরিশ্রম ভুলিয়া নিদ্রায় অভিভূত। বহু কোলাহলপূর্ণ রাজবাটীও শান্তিভাব ধারণ করিয়াছে। সুবিমল জ্যোৎস্নারাশি শুভ্র সৌধমালার গাত্রে পড়িয়া মরি মরি কি চমৎকার শোভাই ধারণ করিয়াছে। সুষুপ্ত জগতে আর কাহারও সাড়া শব্দ নাই, কেবল চিন্তা যার সহচরী, চিন্তায় যাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, এহেন সুখের সময়ে কেবল তাহারই নিদ্রা নাই, তিনি কেবল

এই সুখ হইতে বঞ্চিত, চিন্তাতুরের নিকট নিদ্রার প্রভুত্ব খাটে না। তাই এ হেন, সময়ে রাজ প্রাসাদের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটী রমণী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না, দেখিলে বোধ হয় যেন কি এক ভয়ানক চিন্তায় রমণীকে এই অল্প বয়সে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। নিদাঘের নিদারুণ উত্তাপে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইয়াছে, গাত্র বসন আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, রমণী চিন্তা সাগরে ভাসমানা, স্পন্দহীন চক্ষের পলক নাই, একদৃষ্টে গবাক্ষ পানে করকপোলে চাহিয়া রহিয়াছেন। চিন্তাজ্বরে যার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার দেহের লাবণ্য থাকে না, সুখ থাকে না, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না। এই ক্ষণকালের চিন্তাতেই যেন রমণী কি এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। রমণীর বিষাদ-ময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিলে তিনি যে ভয়ানক ক্লেশানুভব করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পাঠক! আপনারা কি এই রমণী মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা রাজপুত্রী পদ্মাবতী। আদরে পালিতা স্নেহনীর মাথা, বিপুল রাজবংশের একমাত্র আশা-লতিকা রাজপুত্রীর এতাদৃশ চিন্তা কিসের জন্য, এই সুগভীর নিশীথে কেন নিদ্রাসুখ বিবর্জ্জিতা হইয়া এত কষ্টভোগ করিতেছেন তাঁহার অভাব কিসের, এত অল্প বয়সে বিপুল ধনের অধীশ্বরী রাজ-তনয়ার এরূপ প্রগাঢ় চিন্তার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। ধনের দ্বারা কি মানব জীবনের সকল অভাব সংপূরণ হইতে পারে, অর্থের দ্বারা কি সকল সময়ে সকল কার্য্য সমাধা হয়, জীবনের এমন অনেক অভাব উপস্থিত হয়, যাহা অর্থের সাধ্যাতীত, নতুবা অতুল-ধন-সম্পদশালিনী রাজকন্যার এত কষ্ট, এত দুঃখ কেন? পাঠক! আসুন, আমরা রাজকন্যার দুর্ব্বিসহ চিন্তার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

গৃহটী রাজোচিত বিধানে সজ্জিত, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া খেলা করিতেছে। পদ্মাবতী শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া স্পন্দহীন জড় পদার্থের ন্যায় অবস্থিতা, এ হেন রাজভোগে, চন্দ্রকর-প্লাবিত এ হেন সুকোমল শয্যায় তাহার চিত্ত সন্তাপ হরণ করিতে পারিতেছে না। এমন সময়ে একটু মলয় বায়ু বহিল ঝুর্ ঝুর্ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এটা ওটা সেটা নাড়া চাড়া করিতে করিতে রমণীর গাত্র স্পর্শ করিল রাজকুমারী শিহরিয়া উঠিলেন, গাত্র বসন স্খলিত হইল। তিনি এই সর্ব্বসুখপ্রদ মলয় সমীর সেবন করিতে গিয়া কোথায় সুখী হইবেন, না আরও হতাশ অবসাদে শিথিল ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন। পদ্মাবতী অবসন্ন দেহে আলু থালু বেশে শয্যায় আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাহাও যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইল।

বিরহিণীর হৃদয়ে সমস্তই অভাব যাহার হৃদয়ে এত অভাব, তাহার পক্ষে সুখদ মলয় সমীর, কোকিলের কুহুরব এ সকল সুখের সামগ্রী ভাল লাগিবে কেন? তাই রাজকুমারী সুখানুভব করিতে গিয়া দুঃখ সাগরে নিমজ্জিতা হইলেন। তিনি অসহ্য দুঃখে অধীরা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় নারী জন্ম কি মহাপাপময়। বিধাতা বোধ হয় সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইবার নিমিত্ত নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। নতুবা তাহাদের তিলমাত্র স্বাধীনতা নাই কেন? বাল্যকালে পিতার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, যৌবনকালে সৌভাগ্যোদয় হইলে পতি প্রেমপাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। বৃদ্ধ হইলেও নিস্তার নাই, সে সময় পুত্রের মুখাপেক্ষী হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে এ সকল দুঃখ ভোগও হইল না, ভগবান আমাকে স্বামীর অধীনও করিলেন না, বোধ হয় এজন্ম বৃথায় অতিবাহিত করিতে হইল, যৌবনে স্বামী-সহবাস-সুখবর্জ্জিত-নারী-জীবনে ফল কি? দেবাদিদেব

ভগবান মহেশ্বর নারীজন্মের একমাত্র সুখ পতিসেবা কি অভাগিনীর ভাগ্যে লেখেন নাই, আর কতকাল এই রূপে জীবন ধারণ করিব। তুমি না সদয় হইলে তোমার এই জন্ম দুঃখিনী তনয়ার যে আর কোন গত্যন্তর নাই। আজি সন্ধ্যাসমাগমে প্রমোদ উদ্যানে যে নবীন সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহাকেই পতিরূপে মিলাইয়া, অভাগিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমি অতিশয় মুগ্ধা হইয়াছি, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, আমার জীবন, যৌবন, দেহ, মন সমস্ত সেই সন্ন্যাসীর চরণে সমর্পণ করিয়াছি। অদৃষ্ট দেব! যদি তুমি সত্য হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় সন্ন্যাসিকে পতিরূপে পাইব। তাহা না হইলে আজীবন কুমারী হইয়া থাকিব তথাপি পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, সন্ন্যাসীর পদ সেবা করিয়া প্রাণ মন সুশীতল করিব, নারী-জন্মের একমাত্র সুখ পতি সুখে সুখিনী হইব। নতুবা তাঁহার সেই অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য-প্রাণারামকারী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কালের সুকোমল ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিব।

পদ্মাবতী সাতিশয় অস্থির হইলেন, তিনি জানিতেন সন্ধ্যাকালে তাহার জননী সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিয়াছেন, রজনী প্রভাত হইলেই তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। তাহা হইলে তাহার গতি কি হইবে, আরত দেখিতে পাইবেন না। সূর্য্য অস্তমিত হইলে নলিনীর গতি কি হইবে।

প্রণয়ের তুল্য মনোরম সামগ্রি জগতে আর কিছুই নাই। আর সম্মোহন-শরাসন-শাসনাভিভূত হইয়া নরজীব করিতে পারে না এমন কাজও নাই। প্রণয়-পিপাসু মানব স্মর-শরজালে বিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ ভুলিয়া, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া

যায়। মানব মন এরূপ রহস্যেরই ভাণ্ডার। পদ্মাবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহ মধ্যে ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। রজনী প্রভাত হইলে তাহার প্রাণের সন্ন্যাসী এখান হইতে চলিয়া যাইবে তিনি তাঁহার পরিচয় জানেন না, আর কখন দেখা হইবারও আশা নাই। এই জন্য তাঁহার হৃদয়-দেবতাকে একবার শেষ দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছা হইল, লজ্জা ভয় সমস্ত বিদূরিত হইল। তিনি জনৈক সহচরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, সহচরীর সহিত তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বকে একবার দেখিয়া আসিবেন,—এই বাসনা।

অন্তরে অন্তরে মিলন হইলে, অন্তরস্থিত ব্যক্তির হৃদয় ভাব তাহার আত্মীয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, সুখে দুঃখে পতিত হইলে উভয়ে সমবেদনা অনুভব করে, এই জন্য বিদেশগত পুত্রের কষ্ট হইলে, স্বদেশে তাহার পিতা মাতার মনে দুঃখের উদয় হয়, প্রবাসী স্বামীর দুঃখে তাহার সাধ্বী পত্নীর হৃদয় কাতর হয়, মন যেন সমস্তই জানিতে পারে।

মহারাণা ভীমসিংহও পদ্মিনীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতেছেন। তাঁহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রিই কেবল সেই চিন্তা, সেই আয়তাননা, কুরঙ্গীনয়নী পদ্মিনীর মোহিনী প্রতিমাখানি হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন। কোন প্রকারেই তিনি সেই আনন্দের ছবিখানিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না, যেন হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে মূর্ত্তিখানি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ভাবনায় এতদূর বিভোর হইয়াছেন যে তাঁহার হিতাহিত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে,—মনে করিতেছেন—আর ভাবিব না, হৃদয় হইতে এ ভাবনা বিদূরিত করিব। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য অন্তর্হিত হইতেছে। তিনি যেন সম্মুখে দেখিতেছেন সেই মূর্ত্তি, সেই মন-নয়নের আনন্দপ্রদ,

একমাত্র ললামভূত পদ্মিনী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিতেছেন--সেখানেও যেন নয়নের ভিতর সেই মূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভীমসিংহ মহা বিপদে পড়িলেন, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছেন না, কিছুতেই এই দুর্ব্বিসহ চিন্তার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায় দেখিতেছেন না। তাঁহার চিন্তা সাগর যেন ক্রমশঃ উথলিয়া উঠিতেছে।

যে ভীমসিংহ সুশীলা ভিন্ন জানেন না, যে সুশীলা তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, যাহার ভালবাসায় ভীমসিংহের হৃদয় ভালবাসাময়, আজ সেই হৃদয়ে এ আবার কি এক নূতন ভাব, শূন্য হৃদয় অধিকার করিতে আসিতেছে? প্রণয়! ধন্য তোমার ক্ষমতা, ধন্য তোমার ইন্দ্রজালিক শক্তিকে। তুমি মানবকে হাসাইতে নাচাইতে পার, আবার অশেষ মর্ম্মপীড়া দিয়া নয়ন-জলে ভাসাইতে পার, জগতে তুমি সব করিতে পার; তোমার ক্ষমতা অসীম অনন্ত। ভীমসিংহের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত মহারাণাকেও তুমি ক্রীড়ার পুত্তলী করিয়াছ। ভীমসিংহ যতই সেই স্মৃতি মন হইতে বিদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ততই যেন সেই সখিগণ পরিবেষ্টিতা পদ্মিনীর মোহিনীরূপ তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে মহারাণা রূপজ মোহে একান্ত বশীভূত হইয়া বলিলেন—"ধিক আমাকে, ধিক আমার সন্ন্যাস ধর্ম্মে, আমি না ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, বিনয় শিষ্টাচার, লজ্জা ও জিতেন্দ্রিয়তার অহঙ্কার করিতাম, আমার সেই অহঙ্কার এখন কোথায়? আমি সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, আমার সে সমস্ত সন্ন্যাস-ভাব এখন কোথায়? আমি নয়ন মনকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর আরাধনায় নিয়োজিত করিয়াছি আজীবন শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমার কি এই ফল লাভ হইল,—যৌবনের দাস হইয়া রহিলাম? এতদিনে বুঝিতে পারিলাম,

ষড় রিপুকে বশীভূত না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে? পরিণামে তাহার এইরূপ বিপদই উপস্থিত হইয়া থাকে। অনঙ্গ বিলাস উপস্থিত হইলে মানুষ যে সহজেই ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হয়, বসন্ত সখার শরে বিদ্ধ হইলে যে লোকে জ্ঞান, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দেয়, এখন আমি তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যাহা হউক, রজনী প্রভাত হইলে এথায় আর থাকিব না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একবার সেই মুর্ত্তিখানি দেখিতে পাইলে মন ও নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন হইত। ভীমসিংহ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন রজনী প্রভাত হইতে এখন বিলম্ব আছে। মহারাণা নিদারুণ গ্রীষ্মে অধীর হইয়া উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সুশীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কাহার পদ শব্দ তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। মনে করিলেন বোধ হয়, কেহ তাঁহার নিকট আসিতেছে, আর এরূপ ভাবে থাকা উচিত নয়। তিনি কপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, শয্যায় শয়ন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একটী রমণীমুর্ত্তি গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রালোকে গৃহ আলোকিত ছিল, বিস্ফারিত নয়নে শয্যা শায়িত ভীমসিংহের মুর্ত্তিখানি নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন প্রিয় বস্তুকে বেশী দিন না দেখিয়া নয়নের সম্মুখে পাইলে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, এ দেখাও সেইরূপ। পাঠক ইনি আমাদের রাজ-কুমারী, পদ্মাবতী প্রিয় দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া একাকিনী আসিয়া-ছেন; হৃদয় ভরিয়া চক্ষের দেখা দেখিবেন—ইহাই একমাত্র ইচ্ছা। পদ্মিনী মনে মনে বলিলেন—মরি মরি! কি চমৎকার রূপ, ইহা কি সন্ন্যাসীর উপযুক্ত, আমার বোধ হয় ইনি কোনরূপ মনোদুঃখে বিরাগী হইয়াছেন, নতুবা আমার মন কেন এত অস্থির হইতেছে, মন যেন বলিতেছে-পদ্মা-ইনি সন্ন্যাসী নন, ইনি তোমারই উপাস্য দেবতা, কিন্তু

হায়! অভাগিনী কি এই দেবতার সেবায় জীবন্ অতিবাহিত করিতে পারিবে" ? স্ত্রীলোক স্বভাবতই লজ্জাশীলা, যদিও এতদূর আসিয়াছেন, তথাপি কথা কহিতে সাহস হইতেছে না। স্ত্রীলোক কখনই এরূপ অসম সাহসিক কার্য্য করিতে পারে না, তবে যে পদ্মা এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন সে কেবল মন্মথের তাড়নায়, যাহাতে মানব লজ্জা, ভয়, মান সমস্ত অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে।

ভীমসিংহ এতক্ষণ কপট নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সহসা নয়নোন্মিলন করিয়া দেখিলেন, চারি চক্ষের মিলন হইল। পদ্মিনী লজ্জায় জড়সড় হইয়া গৃহ বহির্গমনের চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় ভীমসিংহ বলিলেন-এ ঘোর নিশাভাগে একাকিনী গৃহ মধ্যে তুমি কে ?

পদ্মাবতী দেখিলেন এ সময় কথা না কহিলে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। সন্ন্যাসী হয় ত মনে করিবেন—আমি কোন কুঅভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি। এই জন্য তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই ; আমি এই রাজারই কন্যা, নাম পদ্মাবতী ?

ভীমসিংহ। ঘোর নিশাকালে এখানে আসিবার কারণ কি ?

পদ্মা আর কোন কথা কহিতে পারিল না, লজ্জা আসিয়া তাহার মুখাবরোধ করিয়া দিল। ভীমসিংহ বলিলেন—রাজকুমারি! আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি, আমি যেমন অস্থির হইয়াছি, এখন দেখিতেছি তুমিও সেইরূপ, কিন্তু পদ্মে! তোমার ন্যায় রাজকুমারীর কি এরূপ ভাবে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত হইয়াছে। পদ্মা যেন একটু স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, কেন মহাশয়! আমি আপনার কি চুরি করিয়াছি।

ভীমসিংহ। তুমি আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার মনটী চুরি করিয়া পলাইতেছিলে আমি ধরিয়া ফেলিলাম বলিয়াই ত আর পলাইতে পারিলে না।

পদ্মিনীর লজ্জা ভঙ্গ হইল, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—মহাশয়! চোর যদি চোরকে চোর বলে, তাহা হইলে বড়ই দুঃখ হয়। আপনি সন্ন্যাসী বেশে আসিয়া আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, একবার ভাবুন দেখি। আমি সেই জন্য মনোচোরের নিকট মন ফিরিয়া লইতে আসিয়াছি। মহারাণা ভীমসিংহ বলিলেন—পদ্মে! আমি সমস্তই বুঝিয়াছি, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, তুমি রাজকন্যা হইয়া কেমন করিয়া আমার সহগামিনী হইবে?

পদ্মাবতী বলিলেন—প্রভো! আর কেন আমাকে বৃথা সন্দেহ দোলায় দোলাইতেছেন। অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও তাহার উজ্জ্বল জ্যোতি তিরোহিত হয় না। আপনি যে সন্ন্যাসী নন; রাজপুত্র, তাহা আপনাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে, পারিয়াছি। অধিনীকে আর ভুলাইবেন না। এক্ষণে আমাকে প্রকৃত পরিচয় দানে চরিতার্থ করুন।

ভীমসিংহ বলিলেন—রাজনন্দিনি! তুমি যে তীক্ষবুদ্ধিশালিনী, তাহা প্রথম দর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার পরিচয় আর কি দিব, তবে এই মাত্র বলি—রাজপুতনা আমার রাজধানী, নাম ভীমসিংহ, ভাগ্যদোষে বনচারি!

পদ্মিনী পরিচয় শুনিয়া যুগপৎ স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। ভীমসিংহ বুঝিতে পারিলেন, পদ্মা ভয় পাইয়াছে। তিনি বলিলেন—পদ্মে! তুমি ভয় করিও না, বিধাতা সদয় হইয়াছেন।

পদ্মাবতী করযোড়ে বলিলেন—"প্রভো! না জানিয়া কত অপরাধ করিয়াছি, নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। ভীমসিংহ বলিলেন—প্রণয়ের নিকট রাজা মহারাজা নাই, তুমি তাহার জন্য কিছু মনে করিও না।

তোমার ন্যায় গুণবতী রমণীকে অঙ্কলক্ষী করিতে পারিলে আমি ধন্য হইব। তোমাকে আর একবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল ভগবান সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। এক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবার আর বিলম্ব নাই। আমি দ্বারবানকে বলিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করি। এক্ষণে তোমারও নিকট বিদায় হই, স্বরাজ্যে গিয়া তোমার পিতার নিকট লোক পাঠাইয়া তোমাকে পাইবার প্রার্থনা করিব, এবং তোমাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া সকল আশা পরিতৃপ্ত করিব। তুমি কোনরূপ অবিশ্বাস করিও না। ভীমসিংহ তোমরাই, তোমার প্রগাঢ় ভালবাসা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তোমাকে রাজ্যেশ্বরী করিয়া এই ভালবাসার প্রতিদান করিব। এক্ষণে বিদায় দাও।

পদ্মাবতী ছল ছল নয়নে বলিলেন—"প্রভো! নয়নের অন্তরাল হইলে আর এই অভাগিনীকে কি মনে থাকিবে?"

ভীমসিংহ বলিলেন—পদ্মে! তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না, রাণা ভীমসিংহ মিথ্যাবাদী নহে। রাজকুমারি! আর বিলম্ব করিও না, আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও।

পদ্মাবতী আর কি করিবেন, কেবল মাত্র বলিলেন—দাসীর মন প্রাণ সমস্ত আপনার সহিত অনুগমন করিল, কেবল কায়ামাত্র রহিল দেখিবেন যেন দাসীকে বেশী দিন ভুলিয়া থাকিবেন না। ভীমসিংহ বিদায়কালীন দৃঢ় আলিঙ্গনদানে বলিলেন—"হৃদয়তোষিণি! ভীমসিংহও শূন্য মনে চলিল, যতদিন না তোমায় পাইতেছি, ততদিন আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিব না। তুমি কোনরূপ দ্বিধা ভাবিও না, ভীমসিংহ তোমারই; জননীকে আমার প্রণাম জানাইও" এই বলিয়া বিদায় হইলেন। পদ্মাবতী একদৃষ্টে তাঁহার গমন পথ

দেখিতে লাগিলেন—মহারাণা চক্ষের অন্তরাল হইলে, বিষাদিতচিত্তে ধীরে ধীরে নিজ শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। সুখবিভাবরী দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল।
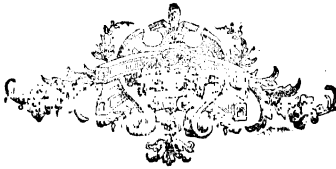
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•—

স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন।

ভীমসিংহ পদ্মার নিকট বিদায় লইয়া ক্রমশঃ স্বরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার কালীন রাজকন্যা পদ্মাবতীর সেই ছল ছল নয়ন সেই বিশুষ্ক মলিন মুখ-কমল, যখনই ভীমসিংহের অন্তরে উদয় হইতেছে, তখনই যেন মহারাণার মন দুঃখে অধীর হইতেছে। চরণ আর চলে না, স্বরাজ্যাভিমুখে আসিতে তাহার পদ যেন আর উঠিতেছে না! ইচ্ছা হইতেছে যেন পুনরায় ফিরিয়া গিয়া, সেই মুখখানি, সেই দুঃখ-বিষাদ-বিজড়িত, নয়ন-জলে-প্লাবিত মুখখানি আর একবার দেখিয়া আসি। এদিকে প্রাণ প্রতীমা সুশীলার জন্যও প্রাণ কাঁদিতেছে, অনেক দিন হইল সে সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা সুশীলার বদনসরোজ না দেখিয়াও মন প্রাণ অস্থির হইতেছে, কাজেই রাজপুতানাভিমুখে ফিরিতে হইল, মনে করিলেন রাজ্যে ফিরিয়া সুশীলার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাকে স্বীকার করতঃ পদ্মাকে লইয়া যাইতে লোক পাঠাইব। সুশীলার

ন্যায় পতিব্রতা কখনই এবিষয়ে অমত করিবে না, আর রাজা হইয়াও ত একাধিক বিবাহ করিতে পারে? তবে আর চিন্তা কি জন্য, এই বলিয়া আশায় হৃদয় বাঁধিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজ্য রাজা শূন্য হইলে তাহার অনেক গোলযোগ ঘটে, অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে মহারাণা ভীমসিংহের রাজত্বে নানা প্রকার অনিয়ম, অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে বৃদ্ধমন্ত্রীর বহুদর্শিতা ও সুশাসন গুণে কেহ কোন অশান্তির অনল প্রজ্জলিত করিতে পারে নাই। মন্ত্রী অনাহারে অনিদ্রায় পরিশ্রম করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। যেখানে কোনরূপ অশান্তির কথা শুনিতেছেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় স্বয়ং যাইয়া, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এদিকে রাণীমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য রাজার অন্বেষণে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা এখন কোন সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

চিন্তাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, জীবন শূন্য দেহকেই দগ্ধ করে। কিন্তু হৃদয়ে চিন্তার অনল জ্বলিয়া উঠিলে তাহা জীবিত দেহকেও দগ্ধ করিয়া থাকে। চিন্তার তুল্য শত্রু মানবের আর কিছুই নাই। পুষ্পে কীট প্রবেশ করিলে যেমন অচিরে সেই পুষ্পকে নষ্ট করে, চিন্তাকীট প্রবেশ করিলে মানব দেহকেও সেইরূপ জর্জ্জরিত করে। পাঠক! পূর্ব্বেও তোমরা সুশীলাকে দেখিয়াছিলে, আর আজ ঐ দেখ, দেখিলে চিনিতে পার কি? যেন এ মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নয় যেন এ সুশীলা সে সুশীলা নয়। দেহের সে লাবণ্য নাই, মুখে সে মধুর হাস্য নাই, অঙ্গের সে সৌন্দর্য্য আর পরিলক্ষিত হয় না।

যেন পূর্ণচন্দ্রকে রাহুতে গ্রাস করিয়াছে! পতিপ্রাণা সতী স্বামী বিরহে যে কীদৃশ মর্ম্ম যাতনা অনুভব করে, এই সুশীলার দুর্দ্দশা দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে। কেবল মাত্র এই পঞ্চদশ দিবস ভীমসিংহের দর্শন না পাইয়া সুশীলার এই দশা, না জানি, আর কিছু অধিক দিন এ বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইলে, তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থাই হইবে। হায় ভগবান! তুমি কেন সুকোমল পুষ্পে কীটের আবাসস্থল করিয়াছ, কেন তুমি সুখদ বসন্তের পর ভীষণ বর্ষার সৃষ্টি করিয়াছ, সুস্নিগ্ধ জোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা রজনীর পর কেন দুরন্ত অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের ব্যবস্থা করিয়াছ, আর কেনই বা সুদীর্ঘ কাল মিলনের পর, প্রাণারামকারী প্রণয়ের পর বিষম বিরহের সৃষ্টি করিয়াছ। এ তোমার কি খেলা জগদীশ! জগতের পিতা হইয়া, সর্ব্ব জীবের সুখদাতা হইয়া, এ তোমার কি লীলা খেলা দয়াময়! দেখ দেব আজ তোমার সৃষ্ট একটী আদর্শ রমণীরত্ন বুঝি বিচ্ছেদ হুতাশনে প্রাণ হারায়, বুঝি প্রিয় বিচ্ছেদে তাহার জীবন যায়।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, বারি রাশির দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ হইতে পারে। কিন্তু বিশাল বারিধি মাঝে বাড়বাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহাকে কিছুতেই নির্ব্বাণ করা যায় না। অন্তরে ক্রোধানল কামানল প্রজ্জ্বলিত হইলে বরং ধৈর্য্যবারি সিঞ্চনে তাহা প্রশমিত হইতে পারে, কিন্তু বিচ্ছেদ হুতাশনে দগ্ধ হইলে, তাহার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। তবে যদি কখন সেই বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ, সেই প্রাণ প্রিয়বরকে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে, সে অনলে জলসেক হইতে পারে, নতুবা তাহার আর অন্য কোন ঔষধ নাই।

প্রাতঃকালে প্রায় সকল জীবের মনেই আনন্দ থাকে, প্রাণ কথঞ্চিৎ সুস্থ ভাব ধারণ করে, ইহা সর্ব্বজনসম্মত। কিন্তু চিন্তায় যার হৃদয় জর জর, তার প্রাণে সুখ কোথা, তার শান্তি চিরতরে তিরোহিত হইয়াছে। সুশীলার প্রাণে তিলমাত্র আনন্দ নাই আজ পঞ্চদশ দিবস হইল, তিনি আনন্দকে অন্তর হইতে বিদায় দিয়াছেন। রাজ্ঞী সুশীলার দিনও নাই, রাত্রিও নাই সদাই সমভাব, সদাই করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, সেই এক ধ্যানে নিমগ্না, তাহার অন্য চিন্তা নাই, কেবল সেই পাদুখানি, তাহা তিনি জীবনের একমাত্র সম্বল বলিয়া মনে করেন যে পাদুখানিকে তিনি এই দুস্তর ভব সাগরের একমাত্র তরণী বলিয়া জানেন, সুশীলার চিন্তা কেবল সেই সর্ব্বার্থ সার স্বামীর রাজীবচরণ, ইহা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পতি পদ ধ্যানে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, এই কয় দিবস তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই; এই কয়দিন যেন তাহাতে তিনি নাই। জীবন শূন্য দেহের যে দশা, ভীমসিংহশূন্য সুশীলার সেই দশা হইয়াছে. প্রত্যহ রাজকার্য্য আরম্ভ করিবার সময় মন্ত্রী আসিয়া যেমন রাজ্ঞীর অনুমতি গ্রহণ করেন, অদ্যও মন্ত্রী আসিয়া অভিবাদন করতঃ রাজ্ঞী সমীপে উপস্থিত হইলেন। সুশীলা বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয়কে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন—তাত! অনুচরগণ কি ফিরিয়া আসিয়াছে? মন্ত্রী বলিলেন—না! আজও কেহ প্রত্যাগমন করে নাই, তবে আর বিলম্ব নাই, শীঘ্রই আসিবে। জননি! আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন, মহারাণা শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই বলিয়া মন্ত্রী রাজসভায় গমন করিলেন।

বেলা প্রায় মধ্যাহ্নের সমীপবর্ত্তী। বিবস্বান্ মধ্য গগনে উদয় হইয়া প্রখর কিরণজালে জগতকে দগ্ধ করিতেছেন, এ সময় বাটী হইতে বাহির হয় এমন কাহার সাধ্য নাই। এই ভয়ানক সময়ে একজন অনুচর আসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রাজসভায় উপনীত হইল, এবং মন্ত্রী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া বলিল—মন্ত্রী মহাশয়! মহারাণা আগত প্রায়, অনুমান অদ্য সন্ধ্যার সময় রাজধানীতে পৌঁছিবেন। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন—রামদেব! তুমি একবার অন্তঃপুরে রাণীমার নিকট এই সংবাদ দিয়া আইস।

রামদেব মন্ত্রী মহাশয়ের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, অন্তঃপুরে সুশীলার নিকট সংবাদ প্রদান করিল।

পতি-বিরহ-বিধুরা রাজ্ঞী সুশীলা পতির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। রাজ্ঞী আনন্দে বিভোর হইয়া বার্ত্তাবহকে একছড়া সোণার হার পারিতোষিক দিলেন। বার্ত্তাবহ রামদেব রাণীমাকে প্রণাম করতঃ নিজ কার্য্যে প্রস্থান্ করিল।

বহু কষ্টে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা সময়ে মহারাণা ভীমসিংহ স্বরাজ্যে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া প্রজাবর্গের মধ্যে এক আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলেই মহারাণাকে দেখিতে আসিল। ভীমসিংহ সকলকেই যথাযোগ্য নমস্কার, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। পরে মন্ত্রীর সহিত বহুক্ষণ বাক্যালাপের পর সেদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রজনী সমাগত হইল।

আতপ-তাপ-তাপিতা পিপাসিতা চাতকিনী জল দর্শনে যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, নব জলদের বারিধারা পানে তাহার যেমন নবজীবন লাভ হয়, সাধ্বীসতী সুশীলা পতির দর্শন পাইয়া তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিলেন।

মহারাণা ভীমসিংহ আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সুশীলার নিকট বলিতে লাগিলেন, শেষে সন্ন্যাসীর কৃপা ও তাঁহার বরে পুত্র-রত্ন লাভ হইবে, তৎসমস্তই বলিলে, কেবল বোম্বাই রাজ চন্দ্রকেশরীর কন্যা পদ্মাবতী সংক্রান্ত কথা গুলি গোপন রাখিলেন।

সুশীলা নিজ প্রাণপতির প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যারপরনাই আহ্লাদ সাগরে ভাসমান হইলেন এবং বলিলেন প্রাণেশ্বর! এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যটনে ত আপনার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই কোথাও ত বিপদে পতিত হইতে হয় নাই? ভীমসিংহ মহাবিব্রতে পড়িলেন, এইবার বুঝি পদ্মাবতীর কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে ভাবিয়া তিনি কথঞ্চিৎ বিমনা হইয়া রহিলেন।

পরে উপর্য্যুপরি জিজ্ঞাসার পর ভীমসিংহ বাধ্য হইয়া পদ্মাবতীর কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিলেন, আসিবার সময় তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। মরি মরি! সতী স্ত্রীর অন্তঃকরণ কি সরলতাময়—সপত্নীর কথা শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণে তিলমাত্র দুঃখের উদয় হইল না, বরং স্বামীকে বিপদে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদিগকে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন পদ্মাবতীকে আপনার বিবাহ করা উচিত, যখন তাঁহারা আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। অতএব আমার অনুরোধ আপনি পদ্মাবতীকে

গৃহে আনয়ন করুন, আমি তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় যত্ন করিব। আমাদের মধ্যে কখনই সপত্নী-বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইবে না, বরং সেই পতি-প্রাণ-রক্ষাকারী রমণী-রত্নের দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম—রাজন্! আমি, পদ্মাবতীর সরল স্বভাবের বিষয় বিলক্ষণ জানি, স্বামিন! আমার অনুরোধ, আপনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

পাঠক!—এরূপ স্ত্রী কি আপনারা কখন দেখিয়াছেন, এ রমণী-রত্ন যে সংসার উজ্জ্বল করিতেছেন, তথায় কি শোক, দুঃখ স্থান পাইতে পারে, তাহা সদাই আনন্দময়; সদাই শান্তিময়। এখনকার স্ত্রীর সহিত কি সুশীলার চরিত্রের তুলনা হয়?

মহারাণা ভীমসিংহ সুশীলার এবম্বিধ জ্ঞানপূর্ণ, নিঃস্বার্থ ভাব-পরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুশীলে! তুমি মানবী আকারে দেবী, তোমার মত গুণবতী প্রণয়িনী যাহার অঙ্কলক্ষ্মী, সে ধন্য, তার অনাহারে বনবাসও মহাসুখকর। তোমার ন্যায় স্ত্রী-লাভে পাপাত্মা ভীমসিংহ পবিত্র হইল। দেবি! তোমারই ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন দানে বহু দিনের আশা তৃপ্ত করিলেন। রাজবাটীও বহুদিনের পর শান্তভাব ধারণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—※—
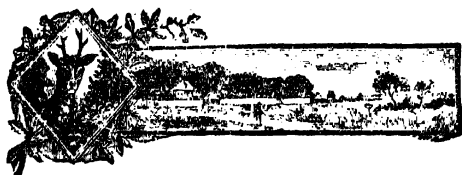
বিরহ-বিধুরা রাজবালা।

সুখ বিভাবরী—দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল, প্রভাতে নবজীবন লাভ করিয়া জীবমাত্রেই হাস্য আস্যে ইতস্তত: বিচরণ করিতেছে; কেবল সরোবরে কুমুদিনীর অবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। নিশাপতি বিহনে কুমুদিনী যেন মৃত-কল্পা হইয়া রহিয়াছে; যেন সে প্রস্ফুটিত ফুল্ল ভাব আর নাই, প্রাণপতির অদর্শনে সতী যেন কতই বিবশা, প্রিয়-বিরহে একান্ত কাতর অন্তঃকরণে সরোবর-সলিলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। শুধু কি সরঃ-সলিলোপরি পতী বিরহে কুমুদিনীর ঐ দশা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ সমাগত দেখিয়া শুধু কি কুমুদিনী দুঃখ সলিলে ভাসমানা, তাহা নহে। পাঠক! ঐ দেখ রাজপুতচন্দ্র ভীমসিংহেরঅদর্শনে আমাদের বোম্বাইরাজ চন্দ্র-কেশরীর একমাত্র আদরের দুহিতা পদ্মাবতীর কি দশা হইয়াছে, প্রিয়-বিরহ-বিধুরা রাজবালার আর সে সৌন্দর্য্য নাই, যেন 'রাহুগ্রস্থ

চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। মন আর কিছুতেই প্রবোধ মানে না, প্রাণে আর কিছুই ভাল লাগে না; জগতের আর কোন বিষয়েই তাঁহার আস্থা নাই, এমন যে সুস্নিগ্ধ মলয়-মারুত, এমন যে কোকিলের সুমধুর-কাকলী-লহরী, বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি সুন্দরীর এমন যে অনুপম শোভারাশি, যাহা দেখিলে সকলেরই মনে আনন্দের উদয় হয়, ইহার কিছুতেই পদ্মাবতী মনে শান্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না, তাঁহার কেবল সেই একই চিন্তা; একই কাম্যবস্তুর প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া রাজনন্দিনী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মরি মরি! রমণীর প্রণয়-অনুরাগ কি মধুর।

রজনীর জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পদ্মাবতী প্রাতঃকালে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইবার জন্য প্রিয় সহচরী প্রভাবতী সহ সৌধশিখরে সমাসীনা হইয়াছেন। প্রিয় জনের অদর্শনে প্রাণে যার অসহ্য বেদনা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে কে? প্রভাবতী সান্ত্বনাচ্ছলে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যেও তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিতেছেন না। পদ্মাবতী প্রাসাদশিখরোপরি উপবেশন করিয়া একদৃষ্টে কেবল সেই বকুল বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। একদিন যে বকুলের তলে তাঁহার প্রাণের সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রাজকুমারী তাহার প্রতি অবলোকন করিয়াই নিজ মনোচোরের ধ্যানে তন্ময় হইয়াছেন। মনে মনে বলিতেছেন—বৃক্ষ! একদিন তোরই আশ্রয়ে আমার প্রাণপতি অবস্থান করিয়াছিলেন, তুইও ধন্য। এই সময় প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে পদ্মাবতীর গাত্রে স্পর্শ হওয়ায় যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন, ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—হে দেব পবন! তোমার একটী নাম সদাগতি, তুমি সকল স্থানেই গমন কর, তোমার অগম্য স্থান জগতে কোথাও নাই, বলিতে পার কি দেব! আমার সেই মনোচোরের

সংবাদ, এখন তিনি কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, দাসীকে কি তিনি চরণে রাখিয়াছেন, ভুলেও কি তিনি এই অভাগিনীর বিষয় মনোমধ্যে স্থান দেন, না একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন? পদ্মাবতী আবার নিজেই প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—না না আমি কি বলিতেছি, প্রাণনাথ কি আমার বিশ্বাসঘাতক, আমি স্ত্রী হইয়াস্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতেছি, তাঁহার নিন্দা করিতেছি, ধিক্ আমার জীবনে! এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী সহচরীর এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল, এবং বলিল—সখি! তুমি রাজার দুহিতা হইয়া সামান্য সন্ন্যাসীর দর্শনে এরূপ আত্মভোলা হইলে চলিবে কেন? সন্ন্যাসী কি রাজনন্দিনীর প্রনয়ের উপযুক্ত পাত্র, না তুমিই তাহার উপভোগ্যা হইবার উপযুক্তা পাত্রী. বাস্তবিক সেই সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিলে আত্মহারা হইতে হয় বটে, তা বলিয়া কি কখন রাজার দুহিতা সন্ন্যাসীর সহিত সন্ন্যাসিনী হইতে পারে? তোমার পিতা মাতা বর্ত্তমান, তাঁহারা কি তোমাকে সন্ন্যাসীর সহিত পরিণীত হইতে দিবেন। সখি! রাজপুত্রী হইয়া কেমন করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত অবস্থান করিবে, কেমন করিয়া সুগন্ধ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সোণার অঙ্গে ভস্ম লেপন করিবে; সুধাধবলিত রাজ-অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যখন তোমার তৃপ্তিবোধ হয় না, তখন তুমি কেমন করিয়া বনের কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সুখবোধ করিবে, যিনি চিরকাল রাজভোগে প্রতিপালিতা, তিনি কি কখন অসহ্য বন ভ্রমণ কষ্ট সহ্য করিতে পারেন অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া কিরূপে অসহ্য সূর্য্য কিরণে ভ্রমণ করিবে? রাজনন্দিনি! শান্ত হও, ও দুরাশা পরিত্যাগ কর, কত শত রাজপুত্র তোমার প্রণয় ভিখারী হইয়া রাজার নিকট আসিতেছে, আর তুমি কিনা সামান্য

সন্ন্যাসীর প্রেমে মুগ্ধ হইতেছ, সিংহ বঞ্চিতা হইয়া অবাধে শৃগাল করে আত্মসমর্পণ করিতেছ, সখি! প্রতিনিবৃত্ত হও, আর অগ্রসর হইও না। এ মিলনে দুঃখ ব্যতীত কদাচ সুখ ভোগ করিতে পাইবে না। রাজনন্দিনী কবে সন্ন্যাসীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনার গৌরব নষ্ট করিয়াছে?

পদ্মাবতী সহচরীর পরুষবাক্য শ্রবণ করতঃ কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন সখি! তুমি সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত কিছু জান না, বৃথা কেন তাঁহার নিন্দা করিয়া আমার এই দগ্ধ প্রাণে ঘৃতাহুতি দিতেছ, আমি যে দিন হইতে সেই প্রাণ-প্রিয় সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ করিয়াছি, সেই দিনই তাঁহার চরণে আমার মন প্রাণ, জীবন যৌবন দান করিয়া বিনা-মূল্যে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছি, ইহজগতে সেই সন্ন্যাসী ভিন্ন পদ্মাবতীর আর কেহই নাই; সেই সন্ন্যাসী ভিন্ন এ জীবনে আর কাহাকেও স্বামীত্বে বরণ করিব না। প্রভা! সেই সন্ন্যাসীই আমার প্রাণ, সেই সুচারু মূর্ত্তিখানি যাহার নয়নপথে একবার পতিত হইয়াছে, সে কি কখন অন্য রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে; তাহার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া রমণীর একমাত্র আরাধ্য সেই চরণ দুখানি নিত্য পূজা করিতে পারিলে কি কখন দেহে কোন ক্লেশ অনুভূত হয়? নারীর পতিই জীবন, পতিই গুরু, পতিই ধর্ম্ম, ইহ ও পরকালের নিস্তারকর্ত্তা ভবার্ণব-নাবিক। সখি! স্বামী বনে, আর আমি রাজ-অট্টালিকায় বসিয়া রাজভোগ করিতেছি! ধিক্ আমাকে! এই বলিয়া গাত্রোত্থান করতঃ আলুথালুবেশে নিম্নে আগমন করিলেন। প্রভাবতী রাজকন্যার মস্তক বিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, তাহার সহিত নামিয়া আসিলেন।

পদ্মাবতী ভবনে অবস্থান না করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যে উদ্যানে তাহার প্রাণের প্রাণ সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন,

উদ্যানের সেই সরোবর সন্নিকটস্থ বকুল-বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশন করতঃ আবার সেই চিন্তা, সেই মহাচিন্তায় পদ্মাবতী একেবারে নিমগ্না হইয়া গেলেন। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া তন্ময় ভাবে হৃদয়রাজ্যে সেই রাজপুতানার রাজা ভীমসিংহকে, তাঁহার মনোচোর সেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতেছেন। প্রভাবতী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, রাজকন্যার এইরূপ ভাব দেখিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে ডাকিলেন—সখি! বেলা অধিক হইয়াছে, আর এখানে থাকা উচিত নয়, চল আমরা গৃহে যাই। প্রভাবতী ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না, আবার দুই তিনবার ডাকিল তথাপি উত্তর নাই। হায়! উত্তর দিবে কে, পদ্মাবতী যে বহু-দিনের পর হৃদয় রাজ্যে তাঁহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইয়াছেন—আর কি তাহার অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ হইতে পারে? প্রভাবতী আর কাল বিলম্ব না করিয়া ভীতচিত্তে রাজ্ঞীকে সংবাদ দিতে প্রস্থান করিল।

রাজ্ঞী একমাত্র আদরের দুহিতা পদ্মাবতীর অসুস্থ সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইয়া উভয়ে দ্রুতপদে উদ্যানমধ্যে আসিয়া দেখিলেন—পদ্মা আলুথালু বেশে, মলিন বদনে বসিয়া ঘোর চিন্তায় অভিভূতা, সাড়া শব্দ নাই, যেন সতী-কুল-সিমন্তিনী-বৈদেহী অশোক কাননে শিংশপা বৃক্ষ তলে রাজীবলোচন রামচন্দ্রের চিন্তায় চিন্তিতা; কোন দিকে দৃষ্টি নাই, জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নাই, যেন চৈতন্য লোপ হইয়াছে। প্রভাবতী ও তাহার জননী যে তাহার নিকট আসিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। প্রভাবতী ডাকিল—"সখি" কোন উত্তর নাই; পুনরায় ডাকিল—পদ্মাবতী! পদ্মাবতী এবার চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, সম্মুখে জননীকে

দেখিতে পাইয়া বিষাদে ক্ষোভে জড়ীভূতা হইয়া নতাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন—মা পদ্মাবতী! তোমার কি কোন পীড়া হইয়াছে; আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই কেবল ভাবিয়া ভাবিয়া সোণার দেহ কালি করিতেছ কেন মা?

পদ্মাবতী জননীর নিকট সমস্ত ভাব গোপন করিয়া, বলিলেন—মা। আমার কোন পীড়া হয় নাই, তবে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা হেতু আমায় সর্ব্বদা এইরূপ দেখিতেছেন। আর কোন উত্তর নাই, পদ্মা নিরব হইলেন। রাজ্ঞী বলিলেন—তার জন্য চিন্তা কি মা! চল গৃহে চল, আমি এখনি রাজাকে বলিয়া রাজবৈদ্য আনাইতে পাঠাইতেছি—এই বলিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।
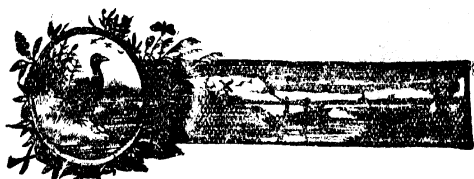
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পীড়া শান্তি।

গভীর চিন্তায়, অনশনে দেহ কত দিন সুস্থ থাকিতে পারে? পদ্মাবতীর রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; রাজভবনে মহা-হুলস্থূল পড়িয়া গেল, পদ্মাবতীর পীড়া শুনিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন, রাজা ও রাণী একমাত্র প্রাণের দুহিতা পদ্মাবতীর পীড়ায় একান্ত অধীর হইলেন। রাজানুমতিক্রমে রাজবৈদ্যসকল আসিয়া রাজকন্যার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার ঔষধ ও রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ দিলেন। নদীতীরে বাসই রোগের অমোঘ ঔষধ স্থিরীকৃত হইলে, রাজা সিন্ধুনদের তীরস্থিত উদ্যানভবনে সপরিবারে কন্যার সহিত আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া পদ্মাবতী যেন কথঞ্চিত সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, রাজা ও রাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। পদ্মাবতী যদিও একটু সুস্থ হইয়াছেন, তথাপি তিনি এখনও সেই চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই।

তাহা কি হয়, চিন্তার হস্ত হইতে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যতদিন জীবন ততদিন চিন্তা, চিন্তা যে জীবনের সহচরী।

কবিরাজগণ বলিয়াছেন—প্রভাত সমীরণ এ রোগের পরম ঔষধ। প্রত্যহই রাজকুমারী অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন সুস্নিগ্ধবায়ু সেবন করেন, আজও পদ্মাবতী অন্য দিনের ন্যায় প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সিন্ধু নদের তীরস্থিত উদ্যানের বাঁধান ঘাটে পদচারণা করিতেছেন, আজ যেন তাঁহার মন সকল দিন অপেক্ষা প্রফুল্ল ; মুখকমলের বিষণ্ণভাব যেন কথঞ্চিৎ তিরোহিত হইয়াছে।

রাজা ও রাণী কন্যার পীড়ার উপশম হইতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত। তাঁহারা জানিতেন যে সন্ন্যাসী বেশে মহারাণা ভীমসিংহ আসিয়া তাঁহার কন্যার চিত্ত হরণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই এই পীড়ার সূত্রপাত। পদ্মাবতী প্রত্যুষে উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, রাজা ও রাণী মনের আনন্দে উদ্যানস্থিত গৃহে বসিয়া কন্যাসংক্রান্ত নানা কথা কহিতেছেন।

রাণী বলিলেন—পদ্মা আমার বড় হইয়াছে, আর অবিবাহিতা রাখা ভাল দেখায় না; আপনি ভীমসিংহের মনোগত ভাব অবগত হইয়া শীঘ্র তাহাকে পাত্রস্থ করুন।

বোম্বাইরাজ চন্দ্রকেশরী রাণীর কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন—রাণি! আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, তবে এ ত আর যে সে রাজা নয়, যে বলিলেই হইবে, তোমা অপেক্ষা আমার চিন্তা অধিক—আমি কি উপায়ে মহারাণাকে সম্মত করাইব, এই চিন্তায় সতত চিন্তিত রহিয়াছি। এই বলিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, রাণীও গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা

জানেন না যে এখানেও যে দশা সেখানেও তাই, সেখানেও ভীম-সিংহের অবস্থা পদ্মাবতীরই অনুরূপ, তবে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে তাদৃশ বিমনা বলিয়া বোধ হয় না। পদ্মাবতী স্ত্রীজাতি, তাই তিনি এত বিহ্বলা।

পদ্মাবতী উদ্যানের ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন, উদ্যানের শোভা বর্ণনাতীত।—নানা জাতীয় সুগন্ধ পুষ্প সকল চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পবন দেব সেই সৌরভ বহন করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। লোকের নাসিকারন্ধ্রে এই সৌগন্ধ ঢালিয়া গন্ধবহ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। বৃক্ষ সকল ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া মননয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। অলিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধু পান করিতেছে, কোকিলকুল ও রসালমুকুলের রসাস্বাদন করিয়া কুহু কুহু রবে শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত করিতেছে; এ উদ্যানে আসিলে সন্তাপিত ব্যক্তিরও প্রাণ সুশীতল হয়।

পদ্মাবতী আঁচল ভরিয়া নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিলেন, আজ সিন্ধুতীরে মনের সাধে স্বামীর চরণ পূজা করিয়া সিন্ধুজীবনে জীবন ত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত ইচ্ছা, এই জন্যই অদ্য তিনি যেন অপরদিন অপেক্ষা ফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছেন।

পদ্মা পুষ্প চয়ন করিয়া সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইলেন এবং মনের সাধে স্বামীর চরণ পূজা করিয়া সিন্ধুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—দেব সিন্ধু নদ! যদিও তুমি সুরতরঙ্গিনী ভাগিরথী নহ, তথাপি তোমার আশ্রয় লইলে তুমি অনায়াসেই পাপিনীর এই পাপ-দেহ পতিতপাবনী জাহ্নবী সলিলে লইয়া যাইতে পারিবে, দেখো দেব! পাপিনী বলিয়া তুমিও যেন ঘৃণা করো না।

পরে ভাগিরথীর উদ্দেশে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া বলিলেন—ও মা! পর্ব্বতনন্দিনি, সুরতরঙ্গিণি! ভবভয়নিবারিণী তুমি জগজ্জনকে তরাই-বার জন্য গঙ্গা যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি রূপে মর্ত্তে বিরাজ করিতেছ। মা! হরিপদ বিহারিণী জগদম্বে! তুমি মুক্তি প্রদায়িনী বলিয়া মহাযোগী মহেশ্বর তোমাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, মা! তোমার পাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম। দেবি। তুমি জীবনরূপে সমগ্র ভারতভূমি পবিত্র করিতেছ; তুমি ত্রিতাপনাশিনী, ত্রিলোকের ত্রিতাপ নাশ করিবার জন্য ত্রিপথগামিনী হইয়া স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্তে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী রূপে প্রবাহিতা হইতেছ! মা ভীষ্মজননি! অপাঙ্গে তোমার এই পাপাঙ্গিনী তনয়াকে একবার দৃষ্টি কর মা!

এইবার ভীমসিংহকে উদ্দেশ করিয়া জোড়-করে বলিলেন—স্বামিন্! পদ্মাবতীর সর্ব্বস্ব ধন, বড় সাধ ছিল,—তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া নারী-জন্ম সফল করিব, কিন্তু নাথ! তাহাত পূর্ণ হইল না, মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল। তুমি বলিয়া গেলে, রাজ্যে পৌঁছিয়াই তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইব; কিন্তু কৈ দেব! আর কতদিন সে কুহকিনী আশা হৃদয় মধ্যে পোষণ করিব, কত-দিন সেই লুব্ধ আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া, এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা অনুভব করিব? জীবিতেশ্বর! আর ত যাতনা সহ্য হয় না, এই জন্যই আজ তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া সিন্ধুর সুশীতল জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিব, হে স্বামিন! হে অধিনীর দেবতা! যেন অন্তে শান্তিলাভ করিতে পারি। এই বলিয়া যেমন সিন্ধু-সলিলে ঝম্প প্রদান করিবেন, অমনি কে যেন পশ্চাৎ হইতে বলিল—প্রিয়তমে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমি আসিয়াছি, অনুসৃতা

নিবন্ধন কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই বলিয়া একটী সুসজ্জিত, সুন্দর বাহু পদ্মাবতীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। পদ্মাবতী চমকিত হইয়া শুনিলেন—সেই স্বর, সেই প্রাণের পরিচিত মহারাণার সুকোমল কণ্ঠস্বর, পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—রাজপুতানাধিপতি মহারাণা ভীমসিংহ রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাহার পশ্চাৎভাগে তাঁহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। অনেক দুঃখচিন্তার পর অপহৃত বস্তু হঠাৎ স্বকরে পাইলে যেমন মনের গতি পরিবর্ত্তন হয়, রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া পদ্মাবতীও তদ্রূপ আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব থাকিয়া, ভীমসিংহ পদ্মাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানে চরিতার্থ করিলেন, ও পদ্মাবতী স্থানান্তর ও পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যারপরনাই দুঃখানুভব করিলেন।

পদ্মাবতীও আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইয়া তাঁহার শারিরীক কুশল ও রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পদধুলি গ্রহণ করিয়া সকল কষ্টের লাঘব করিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী ও চন্দ্রকেশরী মহারাণার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ত্বরিত পদে তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, এবং রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া রাজোচিত বিধানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বিনায়াসে তাঁহারা যে মহারাণা ভীমসিংহের ন্যায় জামাতা পাইলেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে রাজদম্পতী মহারাণা ভীমসিংহের করে কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এতদিনে রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রকৃত পীড়ার শান্তি হইল। মহারাণা ভীমসিংহ শ্বশুর শ্বশ্রূর নিকট বিদায় লইয়া সস্ত্রীক সৈন্যগণ সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবালয়ে স্বপত্নীসনে।

দেখিতে দেখিতে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া গেল। নিশাপতি প্রিয়তমা যামিনীর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন, কেবল সূর্য্যদেবের ভয়ে এখন পত্নীসহবাসে বঞ্চিত; আসি আসি করিয়া আসিতেছেন না। সময়ে সকলেই যায়, সকলই হয় কিছুই, একভাবে থাকিতে পারে না—পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই নিয়ম। সূর্য্যদেব দেখিতে দেখিতে আজিকার মত অবসর গ্রহণ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন! রজনীদেবী প্রিয়পতির দর্শন মানসে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া তারাহারে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। জলে কমলিনী আর থাকিতে পারিল না, স্বপত্নী সৌভাগ্য দর্শনে অসহমানা হইতে লাগিলেন। কমলিনীর দুঃখ দেখিয়া জলচর পক্ষীগণ কলরব করিতে লাগিল। কাহার সৌভাগ্য, কাহার দুর্ভাগ্য, কখন চিরস্থায়ী নহে—ইহার যথার্থ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যেন কুমুদিনীকুল মস্তক উন্নত করিয়া সান্ধ্য-সমীরণে সলিলোপরি আন্দোলিত হইতে লগিল। হায় অভাগিনী পতি বিরহ বিধুরা কমলিনী কি

তাহা দেখিল, মনের দুঃখে সে ম্রিয়মানা, মুদিত হইয়া সলিলোপরি ঢলিয়া পড়িল ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল। পশু পক্ষী জীব জন্তুগণ সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। গৃহপালিত গো মহিষাদি ধূলা উড়াইয়া পালে পালে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল গো-বৎসগণ উর্দ্ধ পুচ্ছে হাম্বা রবে আপনার জননীর অনুগমন করিল। সন্ধ্যা সমাগমে গৃহস্থের গৃহিণীগণ "সাঁজে বাতি" লইয়া এ ঘর সে ঘর করিতে লাগিল। দেবালয় প্রভৃতিতে মাঙ্গলিক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এ সময়ে রাজপুতানাধিপতি মহারাণা ভীমসিংহ পদ্মাবতী সহ দেব মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মহারাণা পদ্মাবতীর সহ স্বরাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া পতিপ্রাণা সুশীলা দাসী সহ তথায় গমন করিলেন।

প্রণয় যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, যিনি প্রণয় কি বস্তু একবার বুঝিতে পারিয়াছেন—তাঁহার প্রণয়বন্ধন শিথিল হইবার কোন কারণ নাই। সুশীলা জানেন, তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে—মহারাণা যতই বিবাহ করুন না কেন, মহারাণা আমারই এবং আমিই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী; আমাদের এ বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়; পদ্মাবতী আমার সহোদরা ভগ্নী, এক্ষণে উভয়ে মিলিয়া মনের সাধে স্বামীর সেবা করিব।

মহারাণা ভীমসিংহ সুশীলাকে সম্মুখে দেখিয়া যেন কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, মনে করিলেন, চরণে ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, আবার ভাবিলেন কেন আমি ত তাহার অমতে কোন কার্য্য করি নাই, তবে ভীত হইবার কারণ কি? সুশীলাই ত আমাকে বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়াছে, যদি তাহাই না হইবে তবে কেন সুশীলা আমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দে মগ্ন

উৎসবে মাতিয়াছে। এই যে সুশীলা সহাস্য বদনে আমার নিকট আসিতেছে। ভীমসিংহ সুশীলাকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জা-সহকারে ঈষৎ মস্তক অবনত করিলেন।

সুশীলা মহারাণার এবম্বিধ ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া পরিহাস সহকারে কহিতে লাগিলেন :—

পাইয়ে নূতনে ভ্রমেও পুরাণে
কেহ নাহি ফিরে চায়।
শুখাইলে ফুল, তায় অলিকুল
ভ্রমেও বসে না হায়।

সুশীলার পরিহাসোক্তি শ্রবণ করিয়া ভীমসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—সুশীলে ! প্রাণসখি ! যে পুরাতনের আদর জানেনা, সে নূতনের আদর করিবে কিরূপে ? আদরিণি ! শিক্ষা ত তোমা হইতেই হইয়াছে, এক্ষণে লাঞ্ছনা দিলে চলিবে কেন ? জীবন সর্ব্বস্ব ধন, পুরাণ হইলেও সে নিত্য নূতন, কারণ সে যে প্রাণের সহিত সংবদ্ধ, প্রাণ যতক্ষণ, ততক্ষণ সে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; তবে প্রিয়ে ! এত চিন্তান্বিতা হইতেছ কেন ?

সুশীলা চিরকালই আমোদপ্রিয়, সরল ভাবে স্বামীর চিত্তাকর্ষণ করিতে তিনি বিশেষ অভ্যস্থা, মহারাণার কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, হৃদয়েশ ! আতপের তাপ পাইবার জন্যই কমলিনী হৃদয় প্রশস্ত করিয়া সূর্য্য কিরণ গ্রহণ করে, প্রাণনাথ ! কমলিনী সূর্য্য প্রেমাকাঙ্খিনী তাও কি তুমি জান না ! আমি সেই আতপের তাপে এত দিন সুখে ছিলাম, তুমি বুঝি সেই সুখ দর্শন করিতে না পারিয়া কমলিনী অরি ছায়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ !

ভীমসিংহ সুশীলার এইরূপ প্রেমের কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার এই সগৌরব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"সুশীলে! অবোধ ললনে! তুমি কি জান না রবি কমলিনীর শত্রু নয়; তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—কমলিনী সূর্য্য গত-প্রাণা কি জল-গত-প্রাণা!"

এইবার তর্কে হারিতে হয় বলিয়া সুশীলা হাসিলেন এবং বলিলেন—কমলিনী যখন পঙ্কে জন্মায়, জলে বর্দ্ধিত হয়; তখন জলগত-প্রাণা বলিতে লইবে।

মহারাণা ভীমসিংহ বলিলেন—"তবে তুমি পঙ্কজকে কেন সূর্য্য-গতপ্রাণ বলিতেছ? সুশীলা স্বামীর নিকট কখন আপনাকে বড় করিয়া রাখিব এরূপ ভাবিতেন না; তবে তিনি নানা কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—নাথ। দেখুন সূর্য্যোদয়ে প্রস্ফুটিত হয়, সূর্য্যাস্তে মুদিত হয়, এই জন্য তাহাকে সূর্য্যগত-প্রাণা বলি।

মহারাণা এইবার বলিলেন—না প্রিয়ে! পঙ্কজিনী সূর্য্যগতা প্রাণা নয়, নলিনী জীবন জলগত; তবে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ সরোবর সলিল শোষণ করে বলিয়া নিজ জীবন রক্ষার জন্য সাধ্যমত হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দেয়। সুশীলে! ছায়া কি কখন নলিনীর শত্রু হইতে পারে, বরং মিত্র, তাহার কারণ সে কমলিনীর প্রতি সূর্য্যের অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া স্বয়ং সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া কমলিনীর জীবন রক্ষার সহায়তা করে।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন—সুশীলা এইবার পরাজিতা হইলেন—শিক্ষা লাভ করিলেন—পরে স্বামীর পরম পবিত্র পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

পদ্মা এতক্ষণ নীরব থাকিয়া স্বামী স্ত্রীর রহস্য শুনিতেছিলেন, এইবার অগ্রসর হইয়া সুশীলার পদধূলি গ্রহণ করতঃ বলিলেন—আপনার
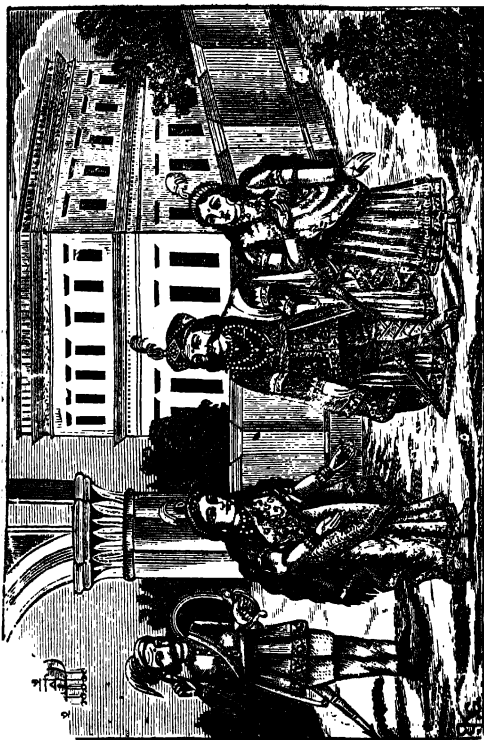
"পদ্মাবতী সহ মহারাণার চিতোর রাজবাটীতে আগমন ও সুশীলার অভ্যর্থনা।"

চিরানুগতা দাসী আপনার পদতলে আশ্রয় ভিক্ষা করে; দাসীকে দাসী বলিয়া গ্রহণ করুন, অভাগিনী আজ পিতা মাতার স্নেহ মমতা ভুলিয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছে। দাসীকে দুমুটা খাইতে দিবেন ও প্রাণনাথের এবং আপনার চরণ সেবার জন্য নিয়োজিত করিবেন, তাহা হইলে আমি ধন্যা হইব, ইহা ব্যতীত আমার আর অন্য আশা নাই।

সুশীলার হৃদয় সততই স্নেহপ্রবণ। পদ্মার এই সকল প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শশব্যস্তে তাহার হস্তধারণ করিরা মুখচুম্বন করিলেন। এবং সস্নেহে পদ্মাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, পদ্মে! ভগিনি! আজ আমি তোমকে পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম; তুমি আমার জীবন-স্বরূপ,—জীবিতেশ্বরের জীবন সর্ব্বস্ব, তোমাকে ভালবাসিব না ত কাহাকে ভাল বাসিব? উপহাসচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাতে কিছু মনে করিওনা। পদ্মে! রমণীদিগের পতিই একমাত্র উপাস্য দেবতা; তুমি পতির মনোমোহিনী, পতির আদরের সামগ্রী, পদ্মে! তুমি কি আমার আদরের সামগ্রী নও, ভগিনি! আমি অপুত্রা, তুমি পুত্রবতী হইলে আমি কি পুত্রবতী হইবনা, সে পুত্র কি আমায় মা বলিয়া ডাকিবেনা? ভগিনি! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পুত্রবতী হইয়া আমার মনোবাসনা সুসিদ্ধ কর। এই বলিয়া সুশীলা পুনরায় পদ্মার মুখ চুম্বন করতঃ ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন।

রজনী ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল। ভীমসিংহ সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—প্রাণাধিকে। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে এক্ষণে চল গৃহে গমন করি। সুশীলা "যথা আজ্ঞা প্রভু" বলিয়া পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া মহারাণার সহ রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! পবিত্র দেব লগ্নে সন্ধ্যাসমাগমে সুশীলার সহিত পদ্মার সাক্ষাৎ ও মিলন হইল। এইত প্রথম দর্শন; এইত জীবন-মিলনের প্রভাতকাল, বলিতে পারেন কি, জীবন-মধ্যাহ্নে কিরূপ ঘটনা সংঘটিত হইবে? আমাদের বিশ্বাস, এ মিলনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, ইহা হইতে কোনরূপ বিচ্ছেদ হলাহল সমুত্থিত হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ লহরী।

ভগবান যাহার প্রতি সদয়—তাহার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। তাহার ধনে পুত্রে লক্ষী লাভ হইবেই হইবে। এতদিন যে অপুত্রক ভীমসিংহ ভাবী নরক-যন্ত্রণা ভয়ে অস্থির হইয়া সদাই ম্রিয়মাণ থাকিতেন, আজি তাঁহার আনন্দের দিন নিকটবর্ত্তী, তাঁহার আদরের পতিপ্রাণা প্রথমা মহিষী গর্ভবতী হইয়াছেন—ভীমসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন, হৃদয় সৌভাগ্য-ভরে নাচিয়া উঠিতেছে। যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীমসিংহ সংসারকে গরলময় জ্ঞান করিয়া আজীবন কানন-বাসী হইবেন স্থির করিয়াছিলেন এক্ষণে সুশীলার গর্ভধারণে তাহার পূর্ব্বেকার সমস্ত বিষাদ, সমস্ত অবসাদ অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার বদন সরোজে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জ্যোতিঃ প্রকাশমান হইয়াছে। তাঁহার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। সুশীলা গর্ভবতী এক্ষণে এইবাক্য যেন তাঁহার গভীর রজনীর বংশীধ্বনি

অথবা প্রভাতকালীন প্রভাতী-সঙ্গীতের ন্যায় কর্ণকুহর পবিত্র করিতে লাগিল। ভীমসিংহ আজ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন, এ আনন্দের সহিত জাগতিক কোন আনন্দের তুলনা হয় না। বসন্তের মলয় পবনে কিম্বা কোকিলের কণ্ঠস্বরে এ আনন্দের ছায়া মাত্র নাই। শুধু কি মহারাণা ভীমসিংহ এই সংবাদে আনন্দিত, শুধু কি তাঁহার অন্তরেই আনন্দ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে? না তাহা নহে. সমগ্র চিতোরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ সংবাদ শ্রবণে আনন্দ-সাগরে ভাসমান, বিশেষতঃ আমাদের অলোক সামান্যা, পরদুঃখ কাতরা পদ্মাবতীর এ সংবাদ শ্রবণে যে কিরূপ আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাহা এই সামান্য লেখনীতে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পদ্মাবতী এক্ষণে ক্ষণেকের জন্যও সুশীলার কাছছাড়া হন না; আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছেন। কখন কোন দ্রব্যের অভিলাষ হয়, কখন কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় ইত্যাদি সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন। সহোদরার ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে দেখিয়া পদ্মার প্রতি সুশীলার প্রগাঢ় আসক্তি জন্মাইতেছে।

এদিকে মহারাণা ভীমসিংহ যেন কল্পতরু হইয়াছেন, অকাতরে দীন দরিদ্রগণকে ধন দান করিতেছেন। পূর্ব্বে রাজা মহারাণার রাজ্যে সামান্য একটী আনন্দের বিষয় সংঘটিত হইলে এইরূপ সকলেই কল্পতরু হইয়া দান কার্য্যে ব্রতী হইতেন, পূর্ব্বে ধনীগণ দানের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতেন, কিরূপে দান করিতে হয় তাহা জানিতেন, তাঁহারা যথার্থ ধনের সদ্ব্যয় করিতেন। পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইত, তাঁহারা পরের দুঃখ আপনার মত অনুভব করিতে পারিতেন, তাই তাহাদের দান করিবার ক্ষমতাও প্রভূত পরিমাণে ছিল। এক্ষণে আর সে রাজাও নাই, সে রূপ দান শক্তির পরাকাষ্ঠাও কেহ দেখাইতে পারে না; এক্ষণে

যদিও অনেকে ধনবান-ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় রাজা মহারাজা হইয়াছেন, যদিও তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে ভারতে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি তাহাদের দান শক্তি তাদৃশ প্রবলা নহে, তাঁহারা প্রকৃত অভাবে দান করিতে জানেন না বা তাঁহাদের তাদৃশ প্রশস্ত হৃদয় নাই, পরদুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাতর হয় না। এক্ষণে তাঁহারা ইংরাজ বাহাদুরের হস্তে অজস্র টাকা দিয়া দান শক্তির মহিমা প্রচার করিতে চাহেন। কোথায় দান করিলে প্রকৃত পক্ষে ধনের সদ্ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহারা আদৌ বিদিত নহেন, তাঁহারা জানেন না যে প্রকৃত অভাবে ধনের সদ্ব্যয় করাই প্রকৃত দান শক্তির পরিচয়, নতুবা ধনীকে ধনদান করিলে কি ফল হইবে? যাহার ধন আছে; তাহাকে ধন দান করিলে ধনের অপব্যয় ভিন্ন আর কি বলিব? আমাদের আর্য্য শাস্ত্রে ভগবান উপদেশস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দান করিবার প্রকৃত ব্যক্তি কে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং" এই অমোঘ শাস্ত্রীয় বিধান কি এখনকার দানকর্ত্তাদের মনে উদয় হয়? ভীমসিংহ কিন্তু দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতেন, দানের তুল্য যে আর সৎকার্য্য জগতীতলে নাই, তাহা তিনি বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন তিনি জানিতেন—

দানই ধর্ম্ম দানই কর্ম্ম
দানই ত্রিদিব বাস।
দানই শক্তি, দানই মুক্তি
দানই যমের ত্রাস।

এইজন্য সামান্য কোন সৎকার্য্যের সূচনা হইলে অগ্রে কোষাগার মুক্ত করিয়া দিতেন; দীন দরিদ্রগণের অভাব মোচন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

এতদিনের পর ভীমসিংহের আঁধার হৃদয়ে সৌদামিনীর বিকাশ হইল; বিষাদমেঘে ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইয়া শারদ কৌমুদি ফুটিল, মায়া-কাননে বিকচ কুসুম বা সংসার মরুভূমে সুশীতল জলপ্রপাত প্রবাহিত হইল। দশমাস দশদিন অতীত হইয়াছে, আজি সুশীলা শুভদিনে শুভ-ক্ষণে একটী পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে বলিয়া মহারাণা এই সন্তানের নাম রাখিলেন "সাধন"। মহারাণা ভীমসিংহ আজি পুত্ররত্ন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর; পদ্মাবতীরও আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। আজি তাঁহার স্বামীর বংশ রক্ষা হইল, পুন্নাম নরক হইতে আজি তাহার প্রাণ প্রিয়বরের পরিত্রাণ হইল, ইহা কি পতিগত, প্রাণা পদ্মার আনন্দের বিষয় নয়? পদ্মার হৃদয়ে সপত্নী বিদ্বেষানল আদৌ প্রজ্জলিত হয় নাই।

অধুনা আমাদের দেশে স্বামী দুইটী বিবাহ করিলেই যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; বেচারী স্বামীর দুইটী ভার্য্যা লইয়া যে কত কষ্ট কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহা এক্ষণকার হিন্দু গৃহের প্রতিনিয়ত কার্য্য কলাপ দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। দুইটী বিবাহ করিলে স্বভাবতঃ স্বামীর প্রতিই স্ত্রীগণের আক্রোশ বৃদ্ধি হয়; স্ত্রীজাতি সকল সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্বামীর ভাগ কাহাকেও দিতে পারে না; এই জন্য সপত্নী বিদ্বেষানল উপস্থিত হইয়া স্বামীর ক্লেশের সীমা পরিবর্দ্ধিত করে। আমাদের সুশীলা ও পদ্মাবতীর ভিতর এরূপ সপত্নী বিদ্বেষানল বর্ত্ত-মান ছিল না, তাঁহারা কেহ কাহার প্রতি হিংসা করিতেন না, এই জন্য মহারাণা ভীমসিংহকেও দুই বিবাহের জন্য কখন কোন রূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। এখন অধিকাংশ বিবাহই ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য, ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম পত্নী গ্রহণ বা পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা প্রভৃতি উদ্দেশ্য এখন আর বিবাহে নাই; এখন স্ত্রী আর স্বামীকে

আপনার হৃদয়ের দেবতা, ইহ ও পরকালের একমাত্র সম্বল বলিয়া ভাবেন না। এক্ষণে যে স্বামী স্ত্রীকে নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করিতে না পারিল, তাহার স্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ মনের মিলন হওয়া অসম্ভব, কথায় কথায় স্ত্রী স্বামীকে বলিয়া থাকেন-তোমার হাতে পড়ে আমার কোন সুখই হলনা, কেবল খাটিতে খাটিতে জীবন গেল। এই ত আধুনিক স্ত্রীগণের উক্তি, তবে ইহাতে তাহাদের মধ্যে সেই পরম পবিত্র প্রণয় কেমন করিয়া বদ্ধমূল হইবে, নিজ সার্থ সিদ্ধির জন্য সতত বিব্রত থাকিলে কি কখন প্রাণের ভালবাসা জন্মিতে পারে ?

ভীমসিংহের প্রতি সুশীলা ও পদ্মাবতীর ভালবাসা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হয় নাই, স্বামীকে তাহারা যথার্থ দেবতার মতই জ্ঞান করিতেন, সপত্নী বিদ্বেষানল তাহাদের মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া ভীমসিংহের সোনার সংসার ছারখার করে নাই।

পদ্মাবতী সাধনকে নিজ পুত্র বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। প্রত্যহ তিনি কালিকা-মন্দিরে সাধনের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেন। এক্ষণে সুশীলা পূর্ব্বাপেক্ষা বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছেন, এইজন্য মহারাণা সুশীলাকে সর্ব্বদা মনের সুখে রাখিবার জন্য আপনি তাহার তত্তাব ধারণ করেন, আর পদ্মাবতী ত দিদির জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। সাধনের সমস্ত ভারই পদ্মাবতী গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত তিনি সুশীলার সেবা করিতেও ত্রুটি করেন না।

মহারাণা ও সুশীলা পদ্মাবতীর এবম্বিধ আচার ব্যবহার দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেছেন। রাজ বাটীর সকলেই পদ্মাবতীর রূপে ও অমানুসিক চরিত্র গুণে একান্ত বশীভূত হইতে লাগিল।

— —

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখের উপর সুখ।

মানবের অদৃষ্ট যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন তার চারিদিকেই সুখ। দুঃখের সময় দুঃখ যেমন নিজ দলবল লইয়া মানবকে আক্রমণ করে সেইরূপ সুখের সময়ও চারিদিকে সুখের উৎস ছুটীতে থাকে, সে যখন যাহা করে তাহা তখনই সুখের মুখ দেখিতে পায়, কখন কাঁদায়, কখন হাসায় পোড়া অদৃষ্টের এমনি ফের।

ভীমসিংহের এখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—সুখের পড়তা পড়িয়াছে তাই তাঁহার চারিদিকেই সুখ, আজি রাজ্যের সহিত মহারাণা ভীমসিংহ সুখের স্রোতে ভাসমান।

দৈবের কি আশ্চর্য্য লীলা! ভীমসিংহ একটী মাত্র পুত্রের জন্য সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কাননে জীবন ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—এক্ষণে সুশীলা পুত্র-রত্ন প্রসব করিয়াছে, আবার একি! পদ্মাবতী পুনরায় গর্ভবতী—তাই বলিতেছিলাম, সুখের সময়

সকল দিকেই সুখের স্রোত বহিতে থাকে। কনিষ্ঠা ভগ্নি পদ্মাবতী গর্ভধারণ করিয়াছেন শুনিয়া সুশীলা বড়ই আনন্দিতা হইলেন, তিনিও পদ্মাবতীর ন্যায় দেবতা ব্রাহ্মনের নিকট তাহার হিতার্থে কতই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা আপনি নিকটে থাকিয়া কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সংসারে পুত্র-রত্ন না থাকিলে তাহাকে সংসারী বলিতে পারা যায় না, পুত্রই সংসারের আলো, প্রাণের সান্ত্বনা, নয়নের মণি, কোলের কোল জুড়ান ধন। তাই পুত্র না থাকিলে সংসার আগার সকলই বৃথা, যাহা লইয়া সংসার, যাহার জন্য সংসারের এত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ, যে বদন-সরোজ নিরীক্ষণ করিয়া সংসারী অন্তে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ পায়, হায়! সংসারে আসিয়া যদি সেই পুত্র রত্ন লাভ না হইল, তবে আর সংসারী হইয়া এ ভব সংসারে সং সাজিবার আবশ্যক কি? তাই বলিতেছি সংসারে যদি একান্তই সং সাজিতে হয়, তবে যেন পুত্র ধনে কেহ বঞ্চিত না হন, তবে পুত্র যাহাতে সৎপুত্র হইতে পারে পিতা মাতাকে তাহার বিষয় চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ পুত্রের ভাল মন্দের ভার পিতা মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—"এই জন্য শাস্ত্র বলেন পিতৃগুণে গুণী পুত্র পিতৃ দোষে দোষী" পাঠক! আত্মার অংশ বলিয়া সতত পুত্রের হিতের জন্য যত্নবান হইবে।

ক্রমে দশ মাস দশ দিন অতিবাহিত হইল, পদ্মাবতী শুভ দিনে ও শুভ ক্ষণে একটী অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য সংযুক্ত পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন—সদ্য-প্রসূত শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়া সূতিকাগার আলো করিতে লাগিল—পুত্রটীর রূপ দেখিলে বোধ হয় বিধাতা যেন আপন সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য নির্জ্জনে এই সন্তানটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পুত্র প্রসবের তুল্য যন্ত্রণা আর নাই, কিন্তু মায়ার এমনি অত্যাশ্চর্য্য লীলা যে প্রসবের পর পুত্র মুখ দেখিয়া জননীর আর সে কষ্ট মনে থাকে না, পুত্রের মুখ দেখিলে সেই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভুলিয়া বাৎসল্য প্রতিমা, সন্তান-বৎসলা জননী পুত্রকে যত্নের সহিত অঙ্কে ধারণ করেন। আহা! জননীর এতাদৃশ দয়া না হইলে কি জীব জগতে জীবের জীবন থাকিত; মরি মরি মাগো! এই হতভাগ্য সন্তানের জন্য তুমি কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছ; আমি এ জীবনে প্রাণ দিয়াও কি তোমার ঐ কষ্টের কণিকা মাত্র পরিশোধ করিতে পারিব—তোমার ঋণ যে পরিশোধ করিবার নয়? তবে মা! এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আজী-বন এ দাসের মনভৃঙ্গ তোমার চরণ কমলের মধুপানে বিরত না হয়, ইহাই আমার জীবনের একমাত্র প্রার্থনা।

পদ্মাবতী পশ্চাৎ ফিরিয়া পুত্রের মুখাবলোকন করতঃ সমস্ত যন্ত্রনা ভুলিয়া গেলেন, পুত্র ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন। পুত্র ক্রোড়ে পদ্মাবতীকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন পার্ব্বতি ষড়াননকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন।

পদ্মাবতী পুত্র প্রসব করিয়াছে শুনিয়া সুশীলা সাধনকে কোলে লইয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন।

সুশীলা সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—পদ্মাবতি! ভগিনি! তোমার জন্য আমার বড় ভয় হইয়াছিল, তুমি ছেলে মানুষ না জানি কতই কাতর হইবে, এক্ষণে ভগবান যে দয়া করিয়া সহজে পুত্রমুখ দেখাই-য়াছেন ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি পুত্রটি দীর্ঘজীবী হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

সুশীলার পুত্র সাধন এক্ষণে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সে পুত্রটিকে দেখিয়া বাল-সুলভ কথায় বলিল হা মা! ছোট মার খোকা কোথায় ছিল?

সুশীলা। বাবা! তোমার ছোট মার পেটের ভিতর ছিল।

সাধন এইবার পদ্মাবতীর প্রতি আবদার করিয়া বলিল—ছোট মা! একবার আমার কোলে খোকাকে দাও না?

পদ্মাবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—বাবা। ভাইকে এখন ছুঁতে নাই, কাল্‌কে তোমার কোলে দেবো। সাধন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইল।

মহারাণা শুনিতে পাইলেন পদ্মাবতী একটী সুকুমার পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন। ভীমসিংহ আনন্দে অধীর হইলেন; এক্ষণে ভীমসিংহকে দর্শন করিলে সাক্ষাৎ আনন্দের পূর্ণ-মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু এই ত আনন্দের সূত্রপাত—জানি না ভবিষ্যতে ইহাদের ভাগ্যে কি ফল ফলিবে! পুরুষের ভাগ্যের কথা এবং নারীর চরিত্রের কথা বিধাতারও অগম্য।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল—রাজবাটী মহা সমারোহে মাতিয়াছিল, এক্ষণে স্থির ভাব ধারণ করিয়া নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত হইয়া সুষুপ্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অকস্মাৎ যুদ্ধের সুত্রপাত।

সুখ কখনই চিরস্থায়ী নয়—বিদ্যুৎ আলোকবৎ ক্ষণস্থায়ী।—এই সুখের মুখ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি; পরক্ষণেই তথায় ঘোর বিষাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে, এই আলো পরক্ষণেই অন্ধকার। সুখ-নদীর স্রোত সদৃশ, এই জোয়ার আসিয়া দুকুল ভাসাইয়া দিতেছে; ক্ষণকাল পরে সেই জল নদী-গর্ভশায়ী হইয়া সমুদ্রপথে গমন করিতেছে। এই আমরা সুখস্রোতে ভাসিয়া কতই আমোদ প্রমোদ করিতেছি; পরদিন ঘন মেঘরাশি সদৃশ দুঃখরাশি উদয় হইয়া হৃদয়কে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে। এই চকোর বৃক্ষশাখে বসিয়া চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করতঃ মনানন্দে কতই আনন্দের গীত গাইতেছে; আনন্দে মত্ত হইয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছে। আবার সেই চকোরের শত্রুতা সাধনের জন্য তন্মুহূর্ত্তে মেঘরাশি উদয় হইয়া করকা সহিত বৃষ্টিপাতে জগত প্লাবিত করিল। ইহাতে চকোরের দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না, কিন্তু সেই বৃষ্টিপাতে তৃষ্ণাতুর চাতকের

পিপাসার শান্তি হইল—সে মনের আনন্দে বিধাতাকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল। এইজন্য বলিতে হয় সুখ দুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে। বিশেষতঃ সুখ-রজনী দেখিতে দেখিতেই প্রভাত হইয়া যায়।

ভীমসিংহ মনের আনন্দে কতই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে—মহারাণা তাহাকে তাহাই প্রদান করিতেছেন, কত শত দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু হায়! বিধাতার চক্ষে আর এ সুখ সহ্য হইল না। ভীমসিংহ সভাসদ পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় যবন-দূত দ্বার দেশে আগমন করিয়া স্বীয় আগমন বার্ত্তা মহারাণার কর্ণ গোচর করাইল। রাজপুতানার রাজধানী চিতোর নগরে সহসা যবন দূতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীমসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে দূতকে সভা মধ্যে আনিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। দূত সভা মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারাণাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া একখানি পত্র প্রদান করিল, ভীমসিংহ পত্র গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন দুরাত্মা যবনেরা দিল্লী আক্রমণ করিয়া ভারত শাসন করিতেছে; আবার কি রাজপুতানার রাজধানী চিতোর অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে? না না তাহা কখনই সম্ভব নয়, ভীমসিংহের শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত প্রবাহিত থাকিতে, দুরাত্মাগণের সে আশা দুরাশা মাত্র, হয় সুতীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিয়া যবন শোণিতে ভারত মাতার তর্পণ করিব, না হয় শত্রুর শাণিত অসিতে জীবন উৎসর্গ করিব। আমরা রাজপুত, আর্য্য সন্তান সেই আর্য্য শোনিত ধমনীতে প্রবাহিত থাকিতে কি ম্লেচ্ছগণ রাজপুতানায় পদার্পণ করিতে পারিবে—কখনই নয়, আমরা নয়

চিরকাল বীর বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা নয় সেই প্রবল পরাক্রান্ত আর্য্যগণের বংশধর; দুরাত্মা যবনগণের সাধ্য কি যে সেই বংশের মর্য্যাদা হরণ করে—এইরূপ মনোমধ্যে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল ;—

মহামহিমার্ণব—

শ্রীল্ শ্রীযুক্ত মহারাণা ভীমসিংহ মহোদয়

প্রবল প্রতাপেষু।

বিদিতার্থ নিবেদন—

আমি খিলিজি বংশ সম্ভূত জেলালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন, আমার প্রবল পরাক্রম সমগ্র ভারতবর্ষে বিদিত, সমুদয় ভারতবর্ষ আমার করায়ত্ব ; আপনার অন্যায় ব্যবহার শ্রবণ করিয়া হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছে, আমার বিপক্ষে সমগ্র ভারতবাসী উত্তেজিত হইলেও কাহার নিস্তার নাই। আমার খুল্লতাত জেলালউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি ছিলাম, আমারই বাহুবলে মালবদেশ অধিকৃত হইয়াছে ; মালব-রাজ বামদেব প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দিল্লী কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছে। আমি সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আলাউদ্দিন। শুনিলাম—তুমি নাকি বোম্বাই রাজ চন্দ্রকেশরীর একমাত্র ললামভূতা কন্যা পদ্মিনী-বেগমকে হরণ করিয়া আনিয়াছ ; তুমি কি এই রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা, দুর্ব্বলের প্রতি তোমার এত বল প্রয়োগ করিবার কারণ কি ? ভীমসিংহ ! তুমি নিশ্চয় জানিও, যখন স্বয়ং আলাউদ্দিন ভারতে পদার্পণ করিয়াছে, তখন সকল হিন্দুরাজার দর্প এককালীন চূর্ণ হইবে। যদি নিজ মঙ্গল প্রার্থনা কর, তবে তিন

লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা সহ পদ্মাকে আমার নিকট প্রেরণ কর, নতুবা শীঘ্রই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, স্বীয় জীবন রক্ষার্থ প্রস্তুত হও। আর আমাকে জয়পুর রাজ্য প্রদান করিতে হইবে, এই দূতকে সম্মান রক্ষার্থ দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও কতিপয় সুশিক্ষিত অশ্ব প্রদান করিবে। ইতি—

দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন।

পত্র পাঠ করিয়া ভীমসিংহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। চক্ষুর্দ্বয় প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল এবং অধরোষ্ঠ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন শাণিত অসিতে দূতের মস্তক দ্বিখণ্ড করি, আবার মনে করিলেন—দূত অবধ্য—তাহার দোষই বা কি; ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল ভীমসিংহ মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সভাভঙ্গের অনুমতি দিলেন, এবং যবন-দূতকে বসিতে বলিয়া মন্ত্রির সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভীমসিংহ মন্ত্রির সহ গৃহে প্রবেশ করিয়া, আলাউদ্দিন প্রেরিত পত্র মন্ত্রিকে পাঠ করিতে দিলেন। মন্ত্রি পত্র পাঠে মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ধরাতলে বসিয়া পড়িলেন।

ভীমসিংহ মন্ত্রীর এবম্বিধ ভাব দেখিয়া বলিলেন—মন্ত্রিন! পত্র পাঠে কোন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া বসিয়া পড়িলেন যে?

মন্ত্রী।—মহারাজ! সিংহের মস্তকে শৃগালের পদাঘাত; দুরাত্মা আলাউদ্দিন কি জানে না যে, আর্য্য বীরগণের বীরদর্পে ভারত শাসিত ছিল, যে রাজপুতানার নাম শুনিলে শত্রুর হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইত—সেই আর্য্য রাজপুত বীরগণের সহিত যখন ম্লেচ্ছ জাতি যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে—তখন রাজপুতানাবাসী তাহাদের

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে; উঃ! দুরাত্মার পরুষ ব্যবহার শুনিলে হৃদয়ের এক একখানি গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়।

ভীমসিংহ।—মন্ত্রি! তুমি কি আলাউদ্দিনকে ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ। তুমি কি জান না—এই ম্লেচ্ছগণ কোথায় আরব হইতে পারস্য আফগানিস্তান জয় করিয়া, ভারতভূমে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে? মালবাধিপতি বামদেব—যাহার নাম শ্রবণ করিলে শত্রু হৃদয় আতঙ্কে জড় সড় হয়, এই আলাউদ্দিন সেই ভীমপরাক্রম মালবরাজকেও জয় করিয়া কারাগারে বন্দী করিয়াছে। দুরাত্মা আলাউদ্দিন দক্ষিণাপথ সমস্ত হস্তগত করিয়াছে, অযোধ্যা বিহার একেবারেই আর্যশূন্য করিয়াছে। সেই আলাউদ্দিন ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া মনে অবজ্ঞা করিও না; মন্ত্রিন! দুরাত্মা আলাউদ্দিন সামান্য বীর নহে। সমুদয় ভারতবাসী বিপক্ষতাচরণ করিয়া ভারতকে যবনশূন্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সমর-বিশারদ আলাউদ্দিন সেই আর্য্য বীরগণকে পদদলিত করিয়া জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছে।

অধিক কথা কি? আলাউদ্দিন এক সময়ে সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সেই সময়ে আলাউদ্দিনের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল, সুলেমান দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া বন মধ্যে আলাউদ্দিনকে আক্রমণ করে, পরে আলাউদ্দিনের সৈন্য বিনষ্ট করিয়া আলাউদ্দিনকে, বর্ষা দ্বারা বিদ্ধ করে, বর্ষা ভাগ্যবশতঃ পদে বিদ্ধ হইলে বীরবর সেইস্থানে শায়িত হইল, সোলেমান তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া বন হইতে বহির্গত হইয়া দিল্লী সিংহাসনে উপবেশন করিল। এবং রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল যে, আলাউদ্দিনকে অরণ্যে ব্যাঘ্রতে বিনষ্ট করিয়াছে, অতএব

আমি আজি হইতে ভারত শাসন করিব। সৈন্য সমুদয় আমার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিবে, বিনানুমতিতে কোন কিছু করিলে কালকবলে প্রেরিত করিব। এদিকে আলাউদ্দিন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে উত্থিত হইল, নিরুপায় হইয়া ভিক্ষুক-বেশে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। পরে স্ব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সোলেমানকে বন্দী করিয়া কালভবনে প্রেরণ করে, দুরাত্মা আলাউদ্দিনের এত প্রবল প্রতাপ, তুমি সেই আলাউদ্দিনকে সামান্য ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ ?

মন্ত্রী। মহারাজ ! আমি আলাউদ্দিনকে ঘৃণা করি না, দুরাত্মার কার্য্য সকলকে ঘৃণা করিতেছি, আলাউদ্দিন সহজ প্রকৃতির লোক নহে। এই দুরাত্মা সেই সময়ে সময়ে নিহত হইলে কি এই নররাক্ষস এরূপ আচরণ করিতে উদ্যত হইত ? খিলিজী বংশতিলক জেলালদ্দিনকে ঈশ্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যাহার দানে দিল্লীতে কেহই ভিক্ষুক ছিল না। যাহার প্রবল প্রতাপে, রাজ্যে কখন শত্রু সমুপস্থিত হইতে পারে নাই, যে জেলালউদ্দিন আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ জ্ঞান করিত, অধিক কথা কি মহারাজ ! এক সময়ে দক্ষিণাপথের প্রায় সমুদয় রাজগণ বিপক্ষতাচরণ করিয়া জেলালউদ্দিনের বিরুদ্ধে বার বার অস্ত্র ধারণ করিতে লাগিল, জেলালউদ্দিন সেই সমুদায় বিদ্রোহীকে শাসন করিয়াছিলেন ; এবং তাহাদিগকে যাবজ্জীবনের জন্য ক্ষমা প্রদান করিয়াছেন, মহাশয় এমন সদাশয় সদাচার সম্রাট কি আর কোন সময়ে হইয়াছে ? না হইবে ? এক সময়ে বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যূন দুই সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী আক্রমণ করিতে আইসে, জেলালউদ্দিন প্রবল পরাক্রান্ত বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত, দুই তিন দিবস যুদ্ধ করে, কোনমতে শাসন করিতে না পারিয়া অবশেষে দিল্লীতে পুনরায় সৈন্য

সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে জেলালউদ্দিনের অধিক সৈন্য নিহত হইয়াছিল, পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জেলালউদ্দিন জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন। কিন্তু সেই বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সকল দোষ ক্ষমা করিয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। দুরাত্মা আলাউদ্দিন গোপনে মালব দেশ জয় করিয়া বলদেবকে সঙ্গে আনিতেছিলেন, পথি মধ্যে দিল্লীরাজকে সংবাদ প্রদান করিলেন যে আলাউদ্দিন বিনানুমতিতে মালব দেশ জয় করিয়া মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না। এই সংবাদ শ্রবণে জেলালউদ্দিন আনন্দে, মালব-বিজেতা আলা-উদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। জেলালউদ্দিন উপস্থিত হইলে এই দুরাত্মা আলাউদ্দিন তাহাকে নিহত করে, এমন বিশ্বাসঘাতক নর-শোণিত-পিপাসু রাক্ষস আর দেখিয়াছেন কি? আহা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, জেলাল-উদ্দিনের সেই কাটামুণ্ড লইয়া নগরের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে এবং কত উৎসব করিয়াছে, কাটামুণ্ডে পদাঘাত করিয়া সেই কাটামুণ্ডকে তরবারির শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়া দ্বারে দ্বারে বলিয়াছে,—এই দুরাত্মা দিল্লী-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভারত শাসন করিতেছিল, দুরাত্মার বিক্রম এখন আলাউদ্দিনের তরবারিতে ভয় পাইয়াছে। কেহ কখনও মনেও ভাবে না আলাউদ্দিন, জেলালউদ্দিনের প্রধান শত্রু। মহা-রাজ! এমন নররক্ত-পিপাসু, রাক্ষস দেখিয়াছেন কি? পাপিষ্ঠ যাহার অন্নে—প্রতিপালিত হইয়াছে, যাহার কৃপায় সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া ভারত জয় করিতেছে, সেই প্রভুকে নিধন করিয়া মন-সাধ পূর্ণ করিয়াছে, দুরাত্মা সহজ প্রকৃতির লোক কি?

ভী। মন্ত্রী আমরা রাজপুত, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। দুরাত্মা আলাউদ্দিন যখন এতদূর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছে, তখন ভীমসিংহের শাণিত অসিতে আর কিছুই থাকিবে না আমরা আর্য্যসন্তান ঢাল আমাদিগের উপাধান, তরবারি আমাদের শয্যা, কাল আমাদিগের নিদ্রা, আমরা কি সেই দুরাত্মা আলাউদ্দিনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিব না? না হয় শত্রুর শাণিত অসিতে জীবন উৎসর্গ করিব; আলাউদ্দিন ম্লেচ্ছজাতি? এরূপ ম্লেচ্ছ জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কি গৌরবের বিষয় নয়? এরূপ নর রাক্ষসকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা আর কীর্ত্তিলাভ কি হইতে পারে? উঃ! ম্লেচ্ছের বাক্য স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়? পদ্মা আমার ধর্ম্মপত্নী; তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ পাঠাইয়াছে। মন্ত্রিন্? দুরাত্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কখন ক্ষত্রিয় ধমনীতে রক্ত স্থির থাকে? যে কোন প্রকারে হউক, যবন কুল নির্ম্মূল করিবই করিব।

মন্ত্রী। মহারাজ যুদ্ধ এক্ষণে স্থির নির্দ্দিষ্ট, আপনি দুরাত্মাকে ইহার সমুচিত উত্তর দিয়া দূতকে বিদায় করুন, আমিও সৈন্য সুসজ্জিত করিবার আদেশ প্রদান করি।

ভীমসিংহ নিজ অভিপ্রায় লিখিয়া দূতকে বিদায় দিলেন এবং অন্দরে গমন করিয়া আমূল বৃত্তান্ত পদ্মাকে জানাইলেন। আলাউদ্দিনের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া পদ্মা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, দুরাত্মা আলাউদ্দিনের এ বাক্য প্রয়োগ করিতে কি জিহ্বা বদন হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না? যবন হইয়া দুরাত্মার এত উচ্চ অভিলাষ, আর্য্য পুত্রকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া আপনার তুষ্টি সাধন করিবে? আমরা বীরবালা বীরবনিতা, দুরাত্মা আলাউদ্দিন ভেক হইয়া সর্পের মস্তকে বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? দুরাত্মা পঙ্গু হইয়া অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘনে উদ্যত

হইয়াছে ওহো—বুঝিয়াছি, কালবশে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে? নতুবা যে রাজপুতানার রাজপুতগণ চিরকাল ভৈরব রবে ধরা প্রকম্পিত করিতেছিল, যে বীরবালাদের নাম শ্রবণ করিলে অন্যের কথা কি শমন পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়, দুরাত্মা আলাউদ্দিন স্বীয় খুল্লতাতকে বিনষ্ট করিয়া এই আর্য্য বীরগণকে পদদলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে? দুরাত্মা ভেক হইয়া ভুজঙ্গের মস্তকে পদাঘাত করিতে উদ্যত, কিন্তু সে যে কাল সর্পের ভক্ষ্য তাহা ভ্রমেও স্মরণ করেনা? কি বলিব আমি সদ্য প্রসূতা, নতুবা স্বকরে অসি চালনা করিয়া যবন কুল নির্ম্মূল করিতাম।

পদ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসিংহের শোণিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং ধীরে ধীরে পদ্মাকে কহিতে লাগিলেন,- পদ্মে? যে ভীমসিংহ ভীমরবে, ভীম পরাক্রমে রাজপুতানা এবং অন্যান্য দেশ প্রকম্পিত করিতেছে,—সেই ভীমসিংহ কি তোমার ন্যায় সাধ্বী-সতীকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইবে? আমি থাকিতে তুমি সংগ্রামে গমন করিবে,—আমি বসিয়া থাকিব, আর কাপুরুষের মত সেই সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিব? পদ্মে! ক্ষান্ত হও, আমি সৈন্য সমুদায় সুসজ্জিত করিবার অনুমতি করিয়াছি স্বয়ংই যুদ্ধে গমন করিব।

সুশীলা শুনিলেন যে ভীমসিংহ সংগ্রামে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ভীমসিংহের নিকট দৌড়িয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, আপনি নাকি সংগ্রামে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন।

ভীম। হাঁ প্রাণাধিকে! দুরাত্মা আলাউদ্দিনকে শাসন করিবার নিমিত্ত স্বহস্তে অসি ধারণ করিব, যবন কুল ধ্বংশ করিয়া, যবন শোণিতে ভারত মাতার তর্পণ করিয়া তবে ভীমসিংহ গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।

সু। নাথ! আমি দুরাত্মা আলাউদ্দিনের বিক্রম সম্পূর্ণ অবগত আছি, দুরাত্মা ভারতে একাধিপত্য করিতেছে; এবং ভারতের নানা দেশ শাসন করিতেছে, শুনিয়াছি মালবাধিপতি বামদেবকে সমরে পরাজয় করিয়া দিল্লী কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, নাথ! সেই প্রবল পরাক্রান্ত আলাউদ্দিনের সহিত কোন প্রকার বিরোধ না করিয়া সন্ধি স্থাপন করুন।

ভী। কি? দুরাত্মা ম্লেচ্ছের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব? যতক্ষণ ক্ষত্রিয় ধমনীতে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ ভীমসিংহ তাহারনিকট সন্ধি স্থাপন করিতে অভিলাষী নহে। সুশীলে! তুমি ক্ষত্রিয় রমণী, বীর-বনিতা হইয়া কোন্ সাহসে সন্ধি-স্থাপন কথা উচ্চারণ করিলে? ক্ষত্রিয় বীর রমনীর এই কি উচিত কথা হইল? এই কি তুমি বীর বনিতা? এই কি তুমি বীরাঙ্গনা? এই কি তুমি বীর দুহিতা? ক্ষত্রিয় হইয়া ম্লেচ্ছের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব? জান না ক্ষত্রিয়েরা সাক্ষাৎ শমনকেও ভয় করে না? ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ নয় পরম ধর্ম্ম? সুশীলে! এই কি বীর বনিতার উচিত কথা হইল?

সু। আপনি না হয়, সংগ্রামে গিয়া স্বীয় মনসাধ পূর্ণ করিলেন, কিন্তু এ অভাগিনীদের গতি কি হইবে প্রভু? আপনি বৃক্ষ আমরা লতা; আপনি কায়া আমরা ছায়া, ছায়া কখন কায়া ছাড়া হয় না; অগ্রে সুশীলার মৃত দেহ দেখুন তৎপরে আপনার যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাই করিবেন। শুনিয়াছি শুভকার্য্যে গমন করিবার সময়, বাম দিকে শব নিরীক্ষণ করিলে মনসাধ পূর্ণ হয়, আমি আপনার বামে জীবন পরিত্যাগ করি, আপনি মৃত দেহ দেখিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করুন।

পদ্মা। দিদি! আপনি জ্ঞান সম্পন্না হইয়া এরূপ অজ্ঞানের ন্যায় কথা বার্ত্তা কহিতেছেন কেন? এ কথা বীরকুলোদ্ভবা রমণীগণের শোভা

পায় না, আপনি বীর-রমণী, বীর-বনিতা, এরূপ বাক্যতো আপনার মুখে শোভা পায় না। স্বামী সমরে গমন করিলে আমরাও স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য, মুণ্ডমালিনী, দনুজদলিনী, মুক্তকেশী, শ্যামার পদযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়ার পরিচয় প্রদান করিব। আমরা নয় আর্য্যসুতা? আপনি কি ক্ষত্রিয়াদিগের পরাক্রম শ্রবণ করেন নাই? প্রবীর জননী জনা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালীন, যজ্ঞ অশ্ব বদ্ধ করিয়া, নিজ পুত্র প্রবীরকে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রবীর বনিতা মদনমঞ্জরী, প্রাণপতির মঙ্গল কামনার জন্য কৃষ্ণের নিকট হইতে অস্ত্র আনিয়া, প্রাণপতিকে সমরে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তো ক্ষত্রিয় কন্যা—আমরা কি ক্ষত্রিয়া নই? আমরা কি এত ভীরু, এত প্রাণাভিলাষিণী? ফাল্গুনী প্রিয়া সুভদ্রা, নিরাশ্রয় দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া ক্ষত্রিয় রমনীর মুখোজ্জল করিয়াছিলেন, যে দণ্ডীকে কৃষ্ণ-বিরুদ্ধ দেখিয়া কেহই আশ্রয় প্রদান করেন নাই, সেই দণ্ডীকে বীর প্রসবিনী সুভদ্রা অভয় প্রদান করিয়া ভীমসেনকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ভীমসেন প্রাণপণ করিয়া দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; তাঁহারাও তো ক্ষত্রিয়; আমরা কি ক্ষত্রিয় নহি? প্রাণ কি এতই মমতার সামগ্রী? যে দেহ কৃমি বিষ্ঠা ও ভস্মাধার! সেই ভস্মাধার দেহ কি এত প্রিয়? আমাদের দেহে কি আর্য্য শোণিত বিন্দুমাত্র নাই? আমরা কি বীর-রমণী নহি? দিদি! আমি কাহারও সাহায্য চাহি না, আমি সদ্য প্রসূতা। এই অবস্থায় অসি ধারণ করিয়া যবন রক্তে ভারত মাতার তর্পণ করিব। কে কাহার পুত্র? প্রাণনাথ অনুমতি দিন, যদি পদে মতি থাকে, যদি ক্ষত্রিয়া হই, আপনার চরণ প্রসাদে যবন বংশ নির্ব্বংশ করিবই করিব। না হয় হাসিতে হাসিতে স্বীয় কলেবর যবন করবালে অর্পণ করিব। দিদি! এই প্রাণ কি চিরকাল পতিকে লইয়া, পতি সুখে

সুখিনী হইবে? হয়ত এখনি বিধর্ম্মের দংশনে লীলা সম্বরণ করিতে হইবে। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন কি ক্ষত্রিয়ার এত প্রিয় নাথ! আমি আপনাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না, আমি স্বয়ং সমরে গমন করিয়া, আলা উদ্দিনের মুণ্ড আপনার শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত করিব? প্রাণনাথ অনুমতি দিন। আমি সংগ্রামে গমন করিয়া আলাউদ্দিনকে বন্দী করিয়া আনিব, দুরাত্মা আলাউদ্দিন কত বল ধারণ করে দেখিব। আমিও মহারাজ চন্দ্রকেশরীর তনয়া--বীরেন্দ্র চিতোরাধিপতির ভার্য্যা, আমাদের দেহে কি ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত নাই? জয় কালীর স্মরণ করিয়া যবন মুণ্ডে বিভূষিত হইয়া, যবন শোণিত পান করিয়া ক্ষত্রিয় বংশের মুখোজ্জল করিব।

সুশীলা। পদ্মে! তুমি সহসা মত্তা হইয়া উঠিলে যে? আমি স্থির বুঝিয়াছি—তোমা হইতে চিতোর নগর ভীষণ সমর-সাগরে লয় হইবে।

ভীম। পদ্মে! ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যতে তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিও, অগ্নি যখন প্রজ্জলিত হইয়াছে, দুরাচার যবনের বাক্য রূপ ঘৃত যখন আমার ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়াছে, তখন শুষ্ক কাষ্ঠ সদৃশ সমুদায় যবন ভস্মীভূত করিবই করিব! ভীরু সুশীলে! তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয়ার পরিচয় প্রদান করিলে? কেবলমাত্র পতির প্রতি ভক্তি থাকিলে পতির সুখে সুখিনী হইলে, তাহাকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে না। পতিভক্তি সহ বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত, তুমি বীর পত্নী হইয়া ম্লেচ্ছ যবন জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলে? যে রাণা চরণে সমুদায় রাজাগণ মাথা নোয়াইতেছে, যে রাণার নিকট সমুদায় ভারত-বাসি কর যোগাইতেছে, যে মহারাণার বিক্রমে ভারত প্রকম্পিত সেই মহারাণা ম্লেচ্ছ যবন জাতির নিকট সন্ধি সংস্থাপন করিবে? সুশীলে! তুমি কোন্ সাহসে এ কথা মুখ হইতে উচ্চারণ করিলে?

আমি এত দিন তোমাকে বীর দুহিতা জানিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতাম, আজ আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হইল, আর তোমার পতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই, তোমার যথা ইচ্ছা সেই স্থানে গমন কর, ভীরু স্বভাবা কামিনীর মুখাবলোকন করিয়া আর আমি দেহকে অপবিত্র করিব না।

সুশীলা। নাথ! আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, আমি আপনাকে আর কোন বাধা দিব না, মা চামুণ্ডার বরে আপনি রণ জয়ী হইবেন।

ভীম। আমি ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া তোমাদের মুখোজ্জ্বল করিব, পদ্মা নিশ্চিন্ত থাক—বেলাও আর নাই, আমি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া দূতকে বিদায় দিই।

নিজ বংশের ভীষণ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সূর্য্যদেব অস্তগিরিতে লুকায়িত হইলেন। ছোট ছোট দীপালোক সদৃশ, গগনে একটী একটী করিয়া তারা উদিত হইতে লাগিল। কাহারও প্রতিকূল কাহারও অনুকূল সমীরণ দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া, কাহাকেও আলো-গিরিতে তুলিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিতেছে, কাহাকেও নিরাশ সাগরে ভাসাইয়া বিপদ তরঙ্গে হাবু ডুবু খাওয়াইতেছে। আজ ভীমসিংহ ভাবনার অকূল পাথারে ভাসিতেছেন। সম্মুখে মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিতে লাগিলেন.—মন্ত্রিন্! যুদ্ধতো অনিবার্য্য। যুদ্ধে জয় আশা নাই। সেনাপতি হামির * এখন এখানে নাই, হামির পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে এস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেনা, দুরন্ত আলাউদ্দিনকে যে প্রকার লিখিয়াছি, বোধ হয় কল্য সৈন্য লইয়া সে চিতোর আক্রমণ করিবে, হামির সম্মুখে নাই,

* হামির ইনি যবন বিদূরিত করিয়া রাজপুতানা স্বাধীন করেন।

সুতরাং আমি সৈন্য দলে সেনাপতি হইয়া যবন বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব। সৈন্য অল্প সংখ্যক আছে। বিপক্ষে অসংখ্য সমর বিশারদ যবন সৈন্য। মন্ত্রী তাহাতেও ভীমসিংহ কখন পরাঙ্মুখ নয়। আমরা আর্য্যসন্তান, যুদ্ধ আমাদের একমাত্র মুক্তির সোপান। অতএব আমি স্বয়ং সমরে গমন করিয়া যবন রক্তে ভারত মাতার তর্পণ করিব। মন্ত্রী! অহিদল পরিবেষ্টিত হইয়া খগপতিকে কি কখন বিনষ্ট করিতে পারে? না অজদলে সিংহের গতি রোধ করিতে পারে?

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষত্রিয়েরা কখন সাক্ষাৎ শমনকেও ভয় করেনা। মৃত্যুকে বন্ধু জ্ঞান করিয়া আলিঙ্গন করে।

ভীম। মন্ত্রি! দুরাত্মা আলাউদ্দিনের চরিত্র শুনিয়া বোধ হইতেছে এতদিনে বুঝি রাজপুত বীরত্ব--গৌরবের লোপ হইল। পদ্মা যেরূপ স্থির সংকল্প করিয়াছে, তাহাতে পুত্রটিরও আশা নাই, সেই সঙ্গে রাজপুত বীরগণও কাল কবলে অস্তমিত হইবে, এ যুদ্ধও মঙ্গলের বিষয়--যে হেতু রাজপুতবাসী সকলে এক স্থানে এক সময়ে গমন করিবে—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? মন্ত্রি! আমি সমরে গমন করিলে পর সাবধানের সহিত তুমি চিতোর রক্ষা করিবে। যতক্ষণ দেহের শোণিত থাকিবে—ততক্ষণ প্রাণপণে গড় রক্ষা করিও।

মন্ত্রী। মহারাজ! সে বিষয় আপনার কোন চিন্তা নাই। যতক্ষণ হস্তে শাণিত অসি থাকিবে, ততক্ষণ অন্যের কথা কি? দেবকুল পক্ষ সমর্থন করিলেও আলাউদ্দিন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেনা। মহারাজ রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর এক্ষণে মন্দিরে গমন করুন, পরদিবস রণরঙ্গিণীর নাম স্মরণ করিয়া রণ রঙ্গে যবন রক্তে ভারত রঞ্জিত করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দিন ও সেলুকাস।

আলাউদ্দিন সিংহাসনে বসিয়া চিতোর আক্রমণের কথা মনে করিতেছেন, এমত সময়ে দূত একখানি পত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। আলাউদ্দিন পত্রখানি লইয়া আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন—পত্রখানি এইরূপ—

প্রবল প্রতাপান্বিত সমর-বিশারদ আলাউদ্দিন

প্রবল প্রতাপেষু—

আপনি দিল্লীশ্বর, আপনার সম্মান হেতু আমার এমন কোন দ্রব্য নাই যে আপনাকে দিয়া আপনার সম্মান রক্ষা করি। ইহার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট অতিশয় অপমানিত হইলাম। আপনি যে লিখিয়াছেন—বোম্বাই অধিপতি চন্দ্রকেশরীর কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখন ধর্ম্ম পত্নী ভিন্ন, পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করে না। আমরা নীচাশয়, কাপুরুষ, পরনারী হারক যবনজাতি

নহি ; আমরা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব আর্য্য সন্তান। আমরা মাতৃঘাতক, বিশ্বাস ঘাতক, পরধন হারী, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী, নরঘাতী, প্রভু হননকারী নিচাশয়, রাজ্যপ্রিয়, ম্লেচ্ছ যবন জাতি নহি। আমরা আর্য্যকুলোদ্ভব, ধর্ম্মপ্রিয়, পিতামাতার দাসানুদাস, সমর-প্রিয়, বীরাগ্রগণ্য রাজপুত, ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের যশ গৌরবে ভূখণ্ড বিদারিত হইতেছে। যাহাদের যশ-গৌরব ধরা ব্যপ্ত হইয়া চিতোর মেখলা সদৃশ হইয়া আছে। আমরা সেই ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব আর্য্য সন্তান। যদি মঙ্গল প্রার্থনা কর, স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য যদি আমার নিকট প্রার্থনা কর, তবেই তোমার মঙ্গল। নতুবা নীচাশয় প্রভু ঘাতক! ক্ষত্রকুল শিরোমণি ভীমসিংহের হস্তে কোন মতে তোর নিস্তার নাই! রে! যবন! ম্লেচ্ছাধম! যখন জ্ঞানাবস্থায় সিংহের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিস, তখন আর তোর নিস্তার নাই, হুতাশন যখন প্রজ্বলিত হইয়াছে; তখন যবনকুল নিশ্চয়ই ধ্বংশ করিয়া তবে নির্ব্বাপিত হইবে। যদি যুদ্ধে প্রাণাহুতি দিতে সাধ থাকে, তবে অচিরে তাহার আয়োজন কর। সংগ্রাম সাধ অবশ্যই মিটিবে, তৎসহ ম্লেচ্ছ নাম ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

মহারাণা ভীমসিংহ।

মহারাণা ভীমসিংহের পত্র পাঠে আলাউদ্দিন ঘৃতার্পিত অনন্ত অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রি দেনুকাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মন্ত্রিন্! আর বিলম্ব করা উচিত নয়; দুরাত্মা ভীমসিংহের অহঙ্কার সূচক পত্রের প্রত্যেক শব্দ যেন আমার হৃদয়ে শেল সমান বিদ্ধ হইতেছে; দুরাত্মা কি দিল্লীর প্রতাপ এখন অবগত হয় নাই; আলাউদ্দিনের সিংহনাদ কখন কি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। দুরাত্মা পরকন্যা অপহরণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ

করিয়াছে, সেই পদ্মার গর্ভে সন্তান লাভ করিয়া পাপিষ্ঠের এত তেজ, এত অহঙ্কার; দেখিব পাপিষ্ঠ কেমন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে; পাপাত্মা ভীমসিংহের হস্ত পদ শৃঙ্খলিত করিয়া, তাহার সম্মুখে তাহার সন্তানের মস্তকচ্ছেদন ও পদ্মাকে সবলে কাড়িয়া লইয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিলে আমার আর নিস্তার নাই। মন্ত্রী তুমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে চিতোরের মাঠ ঘাট চারিদিক পরিবেষ্টন কর, আমি স্বয়ং সুসজ্জিত হইয়া আসি। এই বলিয়া আলাউদ্দিন বেগে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সেলুকাস চতুরঙ্গে পরিবেষ্টিত হইয়া চিতোর নগর অবরোধ করিল; এমন সময়ে মহারাণা ভীমসিংহ সিংহ-বিক্রমে বহির্গত হইয়া বলিলেন—পাষণ্ডগণ! দণ্ডপাণির কালদণ্ড একান্তই আজ তোদের জন্য বহির্গত হইয়াছে; রাজপুতনাধিপতি ভীমসিংহের মুষ্ট্যা-ঘাতে করিকুম্ভ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়; তোরা সামান্য হীনবল হইয়া কোন সাহসে আমার সন্মুখীন হইয়াছিস্; এক্ষণে যদি স্বয়ং মহম্মদ আসিয়া তোদের পক্ষ সমর্থন করে, তথাপি মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই। এই বলিয়া অসি নিষ্কাসিত করিলেন; সেলুকাস ভীমসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে বলিলেন—রে কুলাঙ্গার! আর বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, এই অসংখ্য যবন-জালে ক্ষীণ প্রাণ রাজপুত মীন নিশ্চয়ই আবদ্ধ হইবে. এক্ষণে আর পলাইবার পথ নাই, এবার তোর ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর, এই বলিয়া অসি বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল। দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল. কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত ভীমসিংহের নিকট সেলুকাসের বিক্রম কতক্ষণ; সেলুকাস কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই মহারাণার অসি প্রহারে বিচেতন্ হইয়া গেল; যবন সৈন্য ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; মহারাণা ভীম-

সিংহ অবশেষে সেলুকাসকে বন্দী করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন। ভীমসিংহ এইবার আলাউদ্দিনের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—বোধ হয়, দুরাত্মা আলাউদ্দিন এইবার সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিবে; কিন্তু ভীমসিংহের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিতে পাপিষ্ঠকে কখনই প্রবেশ করিতে দিবে না।

এদিকে চিতোর কারাগারে নিজ সেনাপতি বন্দী হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া আলাউদ্দিন আর স্থির থাকিতে পারিল না; সৈন্যগণকে পুনরায় প্রোৎসাহিত করিয়া সমর সাগরে অবগাহন করিলেন।

তারাপতি কুমুদিনীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া অস্তগিরিতে অঙ্গ লুক্কায়িত করিলেন। পিকরাজ পঞ্চমস্বরে যেন চিতোর বীরবৃন্দকে বীরমদে মত্ত করিতে লাগিল মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আর্য্যগণের প্রতি ম্লেচ্ছগণের অত্যাচার দেখিয়া সূর্য্যদেব যেন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্বাচলে উদয় হইতে লাগিলেন। অসংখ্য যবন দল পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিল, ভীমসিংহ সংবাদ পাইয়া রণ ক্লান্ত সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! তোমরা কখনই সমরে পরাঙ্মুখ নহ; সমরানলে গমন করিয়া যবন রক্তে ভারত মাতার তর্পণ কর। তোমরা রাজপুতানাবাসী হইয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতা করিও না, জন্ম হইলেই মরিতে হইবে, তবে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য এত মমতা কি? জন্মভূমির উদ্ধার বীরোচিত কার্য্য তোমাদের ন্যায় আর্য্যগণ কখনই জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাই বলিতেছি সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বীরপণা প্রদর্শন কর। ভীমসিংহের বাক্য শুনিয়া বীরগণের হৃদয়ে পুনরায় নব বলের সঞ্চার হইল, তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে অসি হস্তে পুনরায় রণাভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

এদিকে আলাউদ্দিন অসংখ্য সৈন্য সহ সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিশেষ নিপুণতার সহিত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহারাণা প্রাণপণে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন, মহারাণার সৈন্যগণও প্রভুর আদেশ মত সমরে বীরপণা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু এবার যবন সৈন্যগণ যেরূপ যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল, যেরূপ দক্ষতায় যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাতে ভীমসিংহের সৈন্যবৃন্দ কিছুতেই সমকক্ষ হইতে পারিল না, একে একে সকলেই যবন হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিতে লাগিল। মহারাণা তথাপি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, আপন সৈন্যগণ সমরে জীবনাহুতি দিতে লাগিল; ভীমসিংহের তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই, তিনি ভীম পরাক্রমে যবন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অলক্ষিতভাবে একটী তীর মহারাণার শিরোদেশে আসিয়া লাগিল, তিনি হঠাৎ পড়িয়া গেলেন, এই সময়ে দুরাত্মা যবনেরা আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল।

* * * * *

সিংহ জালাবদ্ধ হইল। মুসলমান সৈন্য মধ্যে এইবার আনন্দ সূচক জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। দিল্লীপতি অগ্রসর হইয়া ভীমসিংহকে কহিতে লাগিল,—দুরাত্মন্! এখন তোর সেই বীরদর্প কোথায় রহিল, কোথায়ই বা তোর আর্য্য-শোণিতের ক্ষমতা; এইবার ভারত ভূমে যবন জয়পতাকা উড্ডীন করিতেছি—স্বচক্ষে দর্শন কর। যার জন্য সমর ক্ষেত্রে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছিস্, এইবার সেই পদ্মাকে স্বীয় অঙ্কলক্ষ্মী করিতে পারিলে মনোবাসনা সিদ্ধ হয়। আর যদি তুই স্বইচ্ছায় পদ্মাকে একবার দেখাইতে পারিস্, তাহা হইলেও তোকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিতে পারি।

ভীমসিংহ আর সহ্য করিতে পারিলেন না—দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কহিলেন—ম্লেচ্ছাধম! একবার স্বাধীন হইতে পারিলে সমস্তই দর্শন করাইতাম, তুই অন্যায় সমরে শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ততা করিয়া ভীমসিংহকে বন্দী করিয়াছিস্? কি বলিব আমার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, নতুবা তোর মস্তক পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিতাম। পাপিষ্ঠাধম মনে করিয়াছিস—আমাকে বন্দী করিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণ করিবি। দুরাত্মন! ঘটনা চক্রে পড়িয়া যদিও সিংহকে বন্দী করিয়াছিস; সিংহিনীকে আবদ্ধ করা তোর মত দুর্ব্বল পুরুষের ক্ষমতা নয়, তাহাকে আবদ্ধ করা দৈব সাপেক্ষ। এই বলিয়া সদর্পে ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে লাগিলেন।

ম্লেচ্ছবীর আলাউদ্দিন মহারাণার সগর্ব্ব-বচন শ্রবণ করতঃ ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—আর না—এইবার চিতোরে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নারীবৃন্দ সহ পদ্মাকে আনয়ন করিয়া তাহার সম্মুখে পাপিষ্ঠের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া সমর পিপাসা মিটাইব। এই বলিয়া চিতোরে রমণীগণের প্রতি পাশব অত্যাচার ও তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিবার অনুমতি দিলেন। আলাউদ্দিনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সৈন্যগণ স্ব স্ব কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পদ্মার শৌর্য্য।

যবন সৈন্য দলে দলে চিতোর নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। চিতোর এক্ষণে বীর শূন্য—মহারাণা বন্দী হইয়াছেন; সেনাপতি হামির সিংহ সসৈন্যে পাঞ্জাব আক্রমণ করিতে গিয়াছেন।

যবনগণ স্বভাবতই কামান্ধ, চিতোর রমণীগণের রমণীয় রূপরাশি দর্শন করিয়া একান্ত অধীর হইল এবং আলাউদ্দিনের আদেশ ক্রমে গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল; কামান্ধ পিশাচগণ মনে করিল গৃহে আগুণ লাগিলে, নারীজাতি ভীত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে, কিন্তু দুরাত্মারা জানে না যে বীর-রমণী সতীত্ব অপেক্ষা প্রাণের মায়া বেশী করে না—সতীত্বের জন্য তাহারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, মূর্খ যবনগণ তাহা অবগত নহে।

এবার পদ্মাবতী—হায়! অভাগিনী তিন দিন মাত্র প্রসূত হইয়াছেন; যখন তাঁহার কর্ণে আর্য্যপুত্র বন্দী হইয়াছেন, এই কথা প্রবেশ

করিল—তখন যেন তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল, পদ্মাবতী চকিতের ন্যায় আত্ম-ক্ষোভ সম্বরণ করিয়া নারীগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আর্য্য-রমণীগণের সাহায্য লইয়া যবনগণের সহ সংগ্রাম করিবেন, ইহা প্রকাশ করিলে শত শত বীর রমণী সজ্জিত হইতে লাগিল। *

* ইতিহাসে ইহার প্রকৃত বিবরণ—আলাউদ্দিন ভীমসিংহকে সমরে পরাজয় করিয়া, ভীমসিংহকে কহিতে লাগিলেন যদ্যপি পদ্মাকে একবার দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে মুক্ত করিব; ভীমসিংহ তাহাতে স্বীকার না হওয়াতে আলাউদ্দিন কহিতে লাগিলেন, দর্পণের দূরবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মানা হইলে, দর্পণ মধ্যস্থিত পদ্মাকে দর্শন করিব। ভীমসিংহ ইহাতে স্বীকার করিলে, ভীমসিংহকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। কিছুক্ষণ পরে আলাউদ্দিন সৈন্যসহ চিতোরে আগমন করিয়া ভীমসিংহের নিকট পদ্মার দর্শন প্রার্থনা করিলে পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত সভাস্থলে দর্পণ রাখিলেন এবং পদ্মা অট্টালিকোপরি দণ্ডায়মানা হইলে, দর্পণ মধ্যস্থিত পদ্মাকে দর্শন করিয়া আলাউদ্দিন পদ্মাকে লইবার জন্য পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। ভীমসিংহও সক্রোধে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া আলাউদ্দিনের নিকট বন্দী হইলেন। পদ্মা অন্য আর কোন উপায় না দেখিয়া, দুইসহস্র রমণীবৃন্দসহ আলাউদ্দিনের বাটী গমন করিব, এই সংবাদ আলাউদ্দিনের কর্ণগোচর করাইল। আলাউদ্দিন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল এবং রাত্রিতে দুই সহস্র রমণীবৃন্দসহ পদ্মার আগমন পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল! পদ্মা শিবিকায় দুই সহস্র রমণীবৃন্দ পরিবর্ত্তে নারী বেশধারী ভীমকায় সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাইলেন সেই যোদ্ধাগণ আলাউদ্দিনের বাটীর সমস্ত সৈন্যগণকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া, তৎপরে তাহাদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এদিকে পদ্মা রমণী-

পদ্মাবতী যথার্থ বীর রমণী, তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। প্রাণপতি যবন সমরে বন্দী হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া কি তাঁহার আর জীবনে মায়া আছে। যাঁহাকে লইয়া জীবন, যাঁহার জন্য পদ্মিনী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই জীবনসর্ব্বস্ব বন্দী অবস্থায় অবস্থিত—পদ্মিনী কি আর স্থির থাকিতে পারেন; তিনি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া রমণীগণকে কহিতে লাগিলেন:—

যে করে শোভিছে বলয় ভূষণ।
যে করে শোভিত অগুরু চন্দন।
যে করে সেবেছি পতির চরণ,
যে করে করিব সন্তান পালন।
যে করে করেছি অভয় প্রদান—
সে করে ধরিয়ে শাণিত কৃপাণ
ভৈরবী আকারে নাশিয়ে সমরে,
দনুজদলনী ভাবিয়ে অন্তরে,
যবন শোণিতে ভাসাব চিতোর
দেখিব যবনে কত ধরে জোর!
বীরাঙ্গনা মোরা বীরের পতিনী
ভৈরবী আকারে কাঁপাব মেদিনী।
সহে কিরে হায় ক্ষত্রিয়া পরাণে
আর্য্য-পুত্র বন্দী যবনের রণে।

বৃন্দসহ গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া হাসিতে হাসিতে জীবন ত্যাগ করিল। রাজপুতেরা এই কার্য্যকে জহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে হামীরসিংহ চিতোরের রাণা হইয়া এবং যবনকে বিদূরিত করিয়া রাজপুতানা স্বাধীন করিয়াছিলেন।

তিন দিন আছি সূতিকা আগারে,
যাইব ছাড়িয়া প্রাণের কুমারে।
পতি মোর বন্দী যবন সমরে,
বীর-পত্নী পদ্মা ধৈর্য্য কিসে ধরে।
যা হতে পেয়েছি প্রাণের কুমার,
তাঁহারে করিয়ে সমরে উদ্ধার—
পতি প্রেম ঋণ শুধিব জগতে,
দেখিবে চিতোর ঘোষিবে মহীতে।
বীরাঙ্গনা পদ্মা বীরের রমনী,
পতিব্রতা সতী যবন দলনী।
সাজ সাজ যত সহচরীগণ,
বিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন।

ধন্য বীর রমনী পদ্মাবতী, ধন্য তোমার পতি প্রেমানুরাগ। আজি অবহেলায় তিন দিনের শিশু রাখিয়া সহচরীগণ সহ সমরে প্রমত্তা। সুশীলা ও তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র সাধন পদ্মার সহিত সমরে সমু-খীন হইলেন। ধন্য রাজপুতানা—বীর-পুত্র-ধাত্রী, ধন্য রমনীবৃন্দ পতি অনুরাগিণী।

জগতের ইতিহাসে তোমাদের নাম চিরকাল স্বর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। পদ্মিনী আজ যেন রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভৈরবীগণ সহ দানব বিনাশে সমুদ্যতা। রাজপুত কুলতিলক কুমার সাধন যেন তারকারি সদৃশ শম্ভুসমরে মুক্তকেশীর সহ মিলিত হইয়াছেন।

বীর রমনীগণ প্রমত্তা রণভৈরবীর ন্যায় সমরে অবতীর্ণা; হায় যে কোমল করে পতি পদ সেবা, শিশু পালন, আর্ত্তের সেবা প্রভৃতি কার্য্য সংসাধিত হইত, আজি সেই করে অসি চর্ম্মধারণ, সুকোমল অঙ্গ কঠিন

বর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। কোমলে কঠিনের সমাবেশ হওয়ায় মূর্ত্তি যেন ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। যবনগণ রমণীগণের বীর সজ্জা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহারা যে মূর্ত্তিকে এক সময়ে দেবী সদৃশ শান্ত দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে সাক্ষাৎ কালের মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে; যে উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়কে পূর্ব্বে কামশরাসন বলিয়া অনুমান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা হইতে যেন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সদৃশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে, পূর্ব্বে যে স্বর কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই স্বর যেন কালের ভেরী রব বলিয়া বোধ হইতেছে।

* * * * *

পদ্মাবতী অগ্রসর হইয়া যবনসৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রে কাম পরবশ পশুপ্রকৃতি ম্লেচ্ছগণ! আমরা তোদের ন্যায় নীচ প্রাণী-গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অস্ত্র কলঙ্কিত করিতে চাহি না। আমরা বীরাঙ্গনা, বীরপত্নী, বীর প্রসবিনী তোদের মত সামান্য সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী নহি। ডাক—তোদের সেই ম্লেচ্ছাধম, সমর পিপাসু আলাউদ্দিনকে, তাহারই শোণিতে এই শাণিত কৃপাণ রঞ্জিত করিয়া সমর পিপাসা মিটাইব; তাহারই রক্তে বসুধাকে সিঞ্চিত করিব।" আলাউদ্দিন কিঞ্চিৎ দূরেই অবস্থান করিয়া রমণীবৃন্দের সাহসিকতার পরিচয় পাইতেছিলেন। যেমন পদ্মার দর্শন মানসে অগ্রসর হইয়া আসিবেন, অমনি একটী প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ শর সজোরে নিক্ষিপ্ত হইল। ভাগ্যক্রমে আলাউদ্দিন সেই তীর হইতে অব্যাহতি পাইলেন; অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া পদ্মাবতীর দিকে ফিরিলেন। রোষপরতন্ত্র হইয়া তিনি শাণিত অসি যেমন নিষ্কাশিত করিবেন, অমনি বিপক্ষের অসিতে লাগিয়া সে লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এইবার সেনাপতি হামির সিংহ আসিয়া রাজ্ঞীদ্বয়ের সম্মুখীন হইলেন।

বিপক্ষের প্রবল সৈন্য স্রোত অবলোকনকরিয়া মুসলমানগণ এইবার ভীতচিত্তে রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল।

খলের স্বভাব কিছুতেই যায় না। যবনসৈন্যগণ হিংসাবশতঃ চারিদিকে অগ্নি সংযোগ করিতে লাগিল। পতি পুত্র বিহীনা রমণীগণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। হামীর সিংহ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজধানী ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহার শাণিত কৃপাণ, চপলা সদৃশ শত্রুগণের নয়ন ঝলসিতে লাগিল। মুসলমানগণ হামীর সিংহের রণ-নৈপুণ্য দেখিয়া জয়াশা পরিত্যাগ করিল। অবশেষে জয়-লক্ষী হামীর সিংহের অঙ্কশায়িনী হইলেন। যবনসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল। হামীর সিংহ এইবার নিজ প্রভু ভীমসিংহের উদ্ধার সাধন করিয়া রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলাউদ্দিন এই অবধি চিতোর আক্রমণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিল। ভ্রমেও আর চিতোর আক্রমণের কথা মুখে আনিল না। দুষ্ট কামান্ধ যবন পশু আলাউদ্দিনের উচিত মত শাস্তি হইল—দুষ্টের দমন হইল—চিতোর পুনরায় স্বাধীন হইয়া আর্য্যজাতির বিজয় ভেরী নিনাদিত করিতে লাগিল। শান্তির রাজ্য আবার শান্তভাব ধারণ করিয়া শান্তিময় হইল।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শোকোচ্ছাস।

ভগবান কুমুদপতি পৌর্ণমাসীর সহিত রজনী বিহার করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। প্রকৃতির বংশীধ্বনি স্বরূপ কোকিলের কণ্ঠস্বরে জগৎ জাগিয়া উঠিল। প্রভাতকালীন মৃদুমন্দ সমীরণ কুসুম সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিল। মরীচি মালী পূর্ব্বাকাশে লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে উদিত হইল। বেদপারগ দ্বিজগণ বেদপাঠ করিয়া স্বভাবের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। নিশাদেবীর মণিময় চন্দ্রাতপ সদৃশ নক্ষত্ররাজি কে যেন গগন পাত্র হইতে তুলিয়া লইয়াছে। কবিগণ নিদ্রাদেবীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া কায়মনে ভগবন্নাম করিয়া কবিতা তরঙ্গে তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিলেন।

এখন আর সেই কাল পুরুষের অট্টহাসি সদৃশ হামীর সিংহের অসি ঝনঝনা শব্দ নাই; কালে কাল ভেরী সদৃশ সৈন্যগণের কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে। সকলেই যেন বিরামদায়িনী শান্তির সুকোমল অঙ্কে

শায়িত ; সৈন্যগণের আনন্দনিনাদে চিতোর নগর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বীরবালা পদ্মা বহুদিনের পর পতির পদ সেবা করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন। হামীর সিংহকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ত্বরিত পদে সূতিকাগৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং তন্মধ্যে ধাত্রীও নিজ পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া বাত্যাহত তরুর ন্যায় ভূমে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিতে পারিল যে মুসলমানগণ ধাত্রীর সহ শিশুটী লইয়া বিনাশ করিয়াছে। সকল আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল, রাজরাণী পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন।

এ জগতে পুত্র শোকের তুল্য শোক আর নাই। সকল শোক এক প্রকার সহ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু পুত্র শোকানল সহ্য করা বড়ই কঠিন ; এই শোকে পিতামাতার অস্থি যেন এক একখানি করিয়া খুলিয়া যায়। হায়! পুত্র-হারা অভাগিনী পদ্মারও এই দশাই হইয়াছে, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া হা পুত্র, বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। যে বীর—বালা অপরিসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া সমর সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল, পুত্র শোকানল এক্ষণে তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। শত শত বৃশ্চিকের দংশন যাতনা বরং সহ্য হয়, কিন্তু জননীর পক্ষে পুত্র শোকানল যে ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। বিশেষতঃ তাঁহার পক্ষে যে এ শোক-জ্বালা নূতন—এইজন্য এত অধীরা হইয়াছেন! সুশীলা প্রিয়—ভগ্নী পদ্মাবতীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া অধোবদনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এবং পদ্মাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন—ভগ্নি! বিধাতার মনে যে এতই ছিল, তাহা স্বপ্নের ও অগোচর, প্রিয় পুত্রের অদর্শনেআমরা যে এখন জীবিত

আছি, কঠিন প্রাণত কই বহির্গত হইতেছে না—এই বলিয়া কপালে করাঘাত ও বক্ষতাড়না করিতে লাগিলেন।

পরক্ষণে নয়নের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন,—ভগিনি! পুত্র-শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা করা কাহারও সাধ্য নহে; তুমি বুদ্ধিমতী এবং বীররমণী বলিয়া বলিতেছি-ধৈর্য্য ধারণ কর; কালে যাহা লইয়াছে তাহা আর পাইবার আশা নাই। পুনরায় ভগবানের আশীর্ব্বাদে অচিরে পুত্রবতী হইবে, শূন্য ক্রোড় পরিপূর্ণ হইবে; নিরস্ত হও, হৃদয়কে সান্ত্বনা কর, হায়! এই প্রবোধ বাক্যে কি পুত্রহারা জননীর শোকাগ্নি নির্ব্বাণ হয়? সুশীলার বাক্যে পদ্মাবতীর শোক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, দিদি! বাছাকে যে আমি আর একটীবারও স্তনপান করাইতে পারিলাম না, আমার পোড়া ভাগ্যে এই ছিল! হা পুত্র! তুই কোথায় গেলি, এই বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মহারাণা পদ্মাবতীর অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে পুত্রশোকে একান্ত কাতর ও ধূল্যবলুণ্ঠিতা দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। প্রাণ প্রিয়ার নিকটে বসিয়া গাত্রে হস্তার্পণ করত. সাশ্রুনয়নে কতই প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জলে আগুন লাগিলে—বাড়বাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, তাহা কি শীঘ্র নির্ব্বাণ হয়, অভ্যন্তর প্রদেশে যে পুত্রশোকাগ্নি ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহা কি সান্ত্বনা-বারি প্রদানে একেবারে শীতল হইতে পারে? পুত্রহারা জননীই বলিতে পারেন,—পুত্রশোক তাহার পক্ষে কত যন্ত্রণাদায়ক, অন্যে তাহার কি বুঝিবে?

মহারাণা বড়ই বিপদে পড়িলেন—সুশীলা প্রাণের ভগ্নী পদ্মাবতীর দুঃখে সাতিশয় ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন। কুমার সাধনসিংহ আসিয়া

কতই কাঁদিতে লাগিল। পদ্মাবতী সাধনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাহাকে বুকে লইয়া বলিলেন—বাবা! খোকাকে দুরাত্মা যবনেরা ধাত্রীসহ বিনাশ করিয়াছে; আমি আর এজন্মে তাহাকে পাইব না। সাধন ছোটমার কথা শুনিয়া ভ্রাতৃশোকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আজ চিতোরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রাজ-দুঃখে দুঃখিত; সকলেই শোক সাগরে ভাসমান। যে রাজাবাটী কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দের পূর্ণ মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, আজ যেন তাহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তাই বলি জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, কিছুই চিরকাল সমভাবে থাকে না; লীলাময়ের এমনি লীলা। যখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে কিছুই সমভাবে চিরকাল থাকে না, পদ্মাবতি! বীরপ্রসবিনী মা! মনকে প্রবোধ দাও, ধৈর্য্যধারণ কর, এক সময়ে তোমার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না; জগতে তোমার সৌভাগ্য দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হবে, দেবি! ক্ষান্ত হও, বীর রমণীর ন্যায় হৃদয়ে প্রভূত বল ও ধৈর্য্যের সমাবেশ করিয়া পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত প্রদান কর।
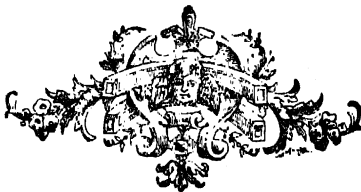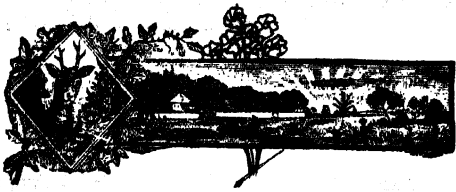
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কানন-কাহিনী।

আরবল্লী পর্ব্বততলে নিবিড়কানন। ঠিক যেন বসন্তের বিলাস-ভবন বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অশান্তির চিহ্নমাত্র নাই। কোকিলের কুহুস্বরে কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে; পাপিয়ার তান, বসন্ত বিহঙ্গের ললিত রাগিণী শুনিলে মন সুধাভিষিক্ত হয়। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বন দেবীর মোহিনী মূর্ত্তি নব মঞ্জুরিত তরু লতা, বিকসিত, কুসুম মাধবীজড়িত তরুরাজি। বনদেবী যেন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রস্ফুটিত-কুসুম-আস্যে হাস্য করতঃ জগতকে হাসাইতেছে। কোথাও হেম লতিকা, কোথাও শ্যাম লতিকা, কোথাও কোথাও হেম লতিকাকুঞ্জে মৃগ মৃগীর সহিত প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। কোথাও যূথপতি দলবল সহ বিচরণ করিতেছে। যাহাদের সহিত খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, তাহারাও অবাধে ভীষণ শত্রুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, কেহ কাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ

করিতেছে না। ময়ূর ময়ূরীগণ তালে তালে নৃত্য করিতেছে। মৃগ শাবকগণ নব মঞ্জরী ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। ভীষণ ব্যাঘ্রগণও তথায় বিচরণ করিতেছে, কিন্তু কেহ কাহার প্রতি হিংসা করিতেছে না; আহা! এইস্থান কি শান্তিনিকেতন? তাহা না হইলে সকলে অশান্তমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া প্রশান্তভাবে বিচরণ করিতেছে কেন? চারিদিকেই শান্তি—কোথাও অশান্তির চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে না। কেবল সময়ে সময়ে বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনা যাইতেছে, এই শব্দের সহ মিশিয়া যেন ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। একি? প্রকৃতির লীলা ভবন বিশ্বেশ্বরের শান্তি-রাজ্যে এ সদ্য প্রসূত শিশুর কাতর কণ্ঠস্বর কেন? এই যে একটী স্বল্প দিনমাত্র প্রসূত, অসামান্য রূপ লাবণ্যসম্পন্ন শিশু মলিন বস্ত্রাবৃত,-পড়িয়া রোদন করিতেছে, ক্ষুধায় কাতর শিশু বস্ত্রাবৃত অবস্থায় পড়িয়া প্রাণপণে রোদন করিতেছে। এমন সময় একটী প্রৌঢ় স্ত্রীলোক কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া একবার মাত্র তাহার নিকট বসিল, বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বৎস! আর আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না। দুরাত্মাগণ অরণ্যের বিপরীত ভাগে কোলাহল করিতেছে; হায়! কোথায় রাজ-বংশের জলপিণ্ড লোপ হইবে বলিয়া ভয়ে তিন দিন মাত্র প্রসূত শিশুকে লইয়া পলায়ন করিলাম,—কিন্তু কই, রক্ষা ত করিতে পারিলাম না—এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাঠক! আপনারা কি চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা সেইস্থান—প্রথম পরিচ্ছেদে যে স্থানে আসিয়া শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রবণ করতঃ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ইহা সেই হিংস্রক জন্তু পরিবৃত বিজন অরণ্য।

কেবলমাত্র প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটী আপনাদের অপরিচিত এক্ষণে ইহার বিবরণ শ্রবণ করুন। যখন দুরাত্মা আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ

করিয়া মহারাণা ভীমসিংহকে বন্দী করিল, সেই সময়ে কুমার সাধন, সাধন-জননী সুশীলা ও সতীকুল শিরোমণি পদ্মা পতির উদ্ধার সাধনার্থ তিন দিবসের শিশুকে ধাত্রী করে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা হইয়াছিলেন। রমণীবৃন্দসহ পদ্মাবতী যুদ্ধে গমন করিলে, ধাত্রী শিশুটীকে বাঁচাইবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, ছিন্ন মলিন বস্ত্রাবৃত শিশুটীকে গ্রহণ করতঃ গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। বহু কষ্টে এক্ষণে আজমীর প্রদেশের প্রান্তভাগে জটিল জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আর রক্ষা করিবার উপায় নাই—দুরাত্মারা তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছে। অরণ্যের মধ্যে এই শিশুটী আমাদের বীর প্রসবিনী পদ্মাবতীর নবপ্রসূত শিশু—আর এই স্ত্রীলোকটী তাঁহার ধাত্রী বাষ্পাকুললোচনে সন্তানের প্রতি বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর অপেক্ষা করিলে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা। তিনি উর্দ্ধ করে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—জগদীশ! আর পারিলাম না,—যাহা মনে করিয়া পুত্রকে লইয়া রাজধানী হইতে বাহির হইয়াছিলাম; সে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারিলাম না। দেখ দেব! আজ তোমার চরণতলে রাজকুমারী পদ্মার একমাত্র নয়নের মণি, আনন্দের দুলাল সন্তানটীকে ফেলিয়া চলিলাম, দয়া করিয়া তুমিই দিয়াছিলে, আবার তুমিই গ্রহণ করিলে—কার সাধ্য রক্ষা করে, ভগবন্! আমার যতদূর সাধ্য করিয়াছি—এক্ষণে তোমার ভার তুমি গ্রহণ কর; আমি স্বচক্ষে ইহার প্রাণবধ দেখিতে পারিব না; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা তুমি, এক্ষণে তোমার যাহা ভাল হয় কর আমি নিরুপায়। এই বলিয়া ধাত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল, কিন্তু প্রাণ কি যাইতে চাহে? কিছু দূর যান, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আবার শিশুর মুখাবলোকন করেন। যবনগণের কোলাহল ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তি হইল। আর অপেক্ষা করা

বিধের নহে। "ভগবান অনাথের বন্ধু—তুমি সকল স্থানেই আছ প্রাণ-পুত্রের ভার গ্রহণ কর"—এই বলিয়া ধাত্রী ত্বরিত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দয়ার নিদান ভগবান যেন ধাত্রীর কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন। বিপুল রাজপুত বংশের ভবিষ্যত আশা—ধন শিশুর প্রতি যেন তাঁহার সর্ব্বদর্শী চক্ষু পতিত হইল। নিরাশ্রয় হইয়া আশ্রয় চাহিলে ভগবানই তাহাকে রক্ষা করেন; এ জগতে যিনি ভগবানের দ্বারা রক্ষিত তাহাকে বিনাশ করে কাহার সাধ্য! কিয়ৎক্ষণ পরে শিশুটী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল ও হস্ত পদ আন্দোলন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধান্তাশ্রম।

আরবল্লী পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ, তৎপার্শ্বেই বিজন কানন; যেন বসন্তের ক্রীড়া-মালঞ্চ অথবা কাল্পনিকদিগের কল্পনার ভাণ্ডার। জন-শ্রুতি আছে - ইহাই সিদ্ধান্তাশ্রম, সিদ্ধান্ত নামক একজন পরম যোগী এই স্থানে বাস করেন। এই স্থানে বসিয়া সিদ্ধান্ত দেব ভগবানের আরাধনা করেন। সিদ্ধান্ত দেবের আপৃষ্ঠ লম্বমান জটাজাল, শ্মশ্রুজাল নাভিদেশ বিলম্বিত, পরিধান বৃক্ষ বল্কল, দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং ভুতভাবন ভবানী-পতি কৈলাসধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি নাই, জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারের ভীষণ বিভীষিকাময় দৃশ্য হইতে সিদ্ধান্তের চক্ষু অন্তর্দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়াছে; জ্ঞান দৃষ্টিতে তিনি ভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন সংযুক্ত চরণদ্বয়ের চিন্তা করিতেছেন। যে চিন্তামণির চিন্তা করিলে অপার ভবপারাবারের কুচিন্তা দুর হয়, যাহার চিন্তা

করিলে সকল চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ঋষিপ্রবর সেই চিন্তায় নিমগ্ন—কাজেই তাঁহার বাহ্য চিন্তা একেবারে নাই।

সিদ্ধান্তাশ্রমে শান্তি-দেবী বিরাজমানা; আশ্রমের সন্নিকটে একটী মনোরম নির্ঝরিণী ঝুরু ঝুরু করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ সকল সুশোভিত; পুষ্পের শোভা সম্পাদনার্থ ভ্রমর সকল গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। বৃক্ষশাখে কতশত পক্ষী আপন মনে সুমধুর স্বরে গান গাহিতেছে। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু সকল হিংসা ভুলিয়া আপন মনে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল, সিদ্ধান্ত দেব এখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন—এখনও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। বেলা আর বেশী নাই দেখিয়া পক্ষীগণ আপন আপন কুলায় গমন করিতে লাগিল। হিংস্রক জন্তুগণ সে দিনেরমত আপন আপন বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সিদ্ধান্তদেবের তপোবন ক্রমশঃ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত অরণ্য এক প্রকার নিস্তব্ধ দেখিয়া একটী বানরী মলিন পুটলী বক্ষে করিয়া সিদ্ধান্ত দেবের সম্মুখীন হইল। বাহ্য জ্ঞান শূন্য ঋষির নিকট বৃক্ষ পত্রের শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি সেই পুটলী রক্ষা করিল এবং জীর্ণ মলিন বস্ত্র সকল অপসারিত করিয়া তদুপরি—মরি মরি একটী অনিন্দ্য কান্তি শিশুকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। শিশুটী গভীর নিদ্রায় অভিভূত। অহো! করুণা নিদান ভগবানের অসীম দয়ার বিষয় মনে ভাবিলে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। পাঠক! বানরী যে শিশুটীকে আনিয়া সিদ্ধান্ত দেবের নিকট রাখিয়া গেল, এ সেই শিশু—চিতোর রাজ্ঞি পদ্মাবতীর অঞ্চলের ধন! বিধাতা যে কখন্ কি উপায়ে জীবের জীবন রক্ষা করেন—একবার দেখিলে কি? তাঁহার দয়া ব্যতীত যে জীব জীবিত থাকিতে পারে না, এই

দৃষ্টান্ত দেখিয়া মানব! তাহা বুঝিতে পারিলে কি? এমন করুণাময় ভগবানের প্রতি আমরা ভ্রমেও একবার ভক্তি প্রদর্শন করি না—দিনান্তে তাঁহার নাম রসনায় রটনা করি না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—তাঁহার অপার করুণা সিন্ধুর কণিকামাত্র না পাইলে, আমরা কি এতদিন জীবিত থাকিয়া ভবতলে বিচরণ করিতে পারিতাম, না নিশার স্বপন-সম সুখে অভিভূত হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারিতাম? ভাই! গণা দিনের আর বেশী দিন বাকী নাই; হয় আজ নয় কাল, নয় দুই বৎসর পরে এ ভবধাম নিশ্চয়ই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু যাইবার সময় এ পারাবারে পার করিবার আর কেহ নাই—কর্ত্তা একমাত্র তিনি; সময় থাকিতে মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া আইস সিদ্ধান্তদেবের ন্যায় তাঁহার আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করি।

দিবা অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগীবরের ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া এই নয়নানন্দকারক শিশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন—একি? তপোবনে নব-প্রসূত শিশু কোথা হইতে আসিল। ধ্যানস্থ হইয়া দেখি—ইহার গুঢ় রহস্য কি? ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধান্তদেব ধ্যান মগ্ন হইয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। এবং চিতোররাজ্ঞী সাধ্বিকুল রমনী পদ্মিনীর হৃদয় মণি, অঞ্চলের নিধি পুত্র রত্ন সম্মুখে দেখিয়া, সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তখন মনে মনে যার পর নাই প্রফুল্লিত হইয়া বলিলেন—আর্য্যকুল গৌরব বীরবর মহারাণা ভীমসিংহের বংশ দুলাল আমার আশ্রমে আনীত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রেরিত, তাহা না হইলে নির্দ্দয় যবনগণের করাল গ্রাস হইতে রক্ষ পাইবে কেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর ভগবানের কোন গুহ্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে। যাহাই হউক, এ শিশুকে এখন মহারাজের নিকট প্রেরণ করিব না; আজ হইতে আমি ইহাকে

লালন পালন করিয়া নির্ম্মল জ্ঞানযোগ শিক্ষা প্রদান করিব। এই পুত্র হইতে এককালে রাজপুতানা ধন্য হইবে, পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে।

দুরাত্মা যবনগণ মনে করিয়াছিল, ধাত্রীর সহিত পন্নার নব-প্রসূত পুত্র এবং সুশীলার অঞ্চলের নিধি সাধনকে বিনাশ করিয়া চিতোর-বাসীর ভবিষ্যৎ আশা ভরসার মূলোচ্ছেদ করিবে। পামরগণ জানেনা যে আর্য্যগণের সহায় ভগবান। পন্নার অঞ্চলের ধন আজ ধাত্রী কর্ত্তৃক —শেষে লীলাময় ভগবানের প্রেরিত বানরী কর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছে। এই বলিয়া স্নেহ রসে হৃদয় অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন—বৎস! আর কোন ভয় নাই; এখানে স্বয়ং কৃতান্ত আসিলেও তোর তিলমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আয় বৎস! কোলে আয়, এই বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন; শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে দেখিয়া, একটী বৃক্ষের বল্কল ছাড়াইয়া দেওয়ায় তাহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় একরূপ নির্য্যাস বাহির হইতে লাগিল। তাহা অতিশয় সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর, সিদ্ধান্ত দেব শিশুকে তাহাই পান করিতে দিলেন—শিশু উদর পুরিয়া সেই সুমিষ্ট রস পান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সিদ্ধান্ত দেব শিশুটী রক্ষা করিয়া সন্ধ্যাকালীন ক্রিয়া-সকল সমাধা করিতে লাগিলেন। ভগবতী-মায়া বুঝে কাহার সাধ্য, সদ্যপ্রসূত সন্তান—যে জননী ক্রোড় ভিন্ন আর কিছুই জানে না, অন্য কোন স্থানে থাকিতে পারে না, আজ অনায়াসে সিদ্ধান্ত দেবের আশ্রমে তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। তাই বলি, ভগবানের লীলা বুঝা সামান্য মানবের সাধ্য নয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সাধন সিংহ।

পাঠক! বহুদিন হইল, আমরা রাজবাটীর কোন সন্ধান গ্রহণ করি নাই। আসুন, একবার রাজবাটীতে পুত্রশোকাতুরা পদ্মাবতী ও অপর সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

পরিবর্ত্তন সংসারের নিয়ম—আজ যাহা দেখি—কাল তাহা দেখিতে পাই না। আজ যাহাকে শিশু দেখিতেছি, কিছু দিন পরে তাহাকে আবার যুবক, যুবক হইতে প্রৌঢ় ও তাহা হইতে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিতে পাই। কালের আবহমান-প্রচলিত শাসনানুসারে সংসারের অপ্রতিহত নিয়মের বশীভূত হইয়া ভীমসিংহ তনয় সাধনসিংহ এখন যৌবন সীমায় পদার্পন করিয়াছেন। কুমার সাধনসিংহ এখন সকলের নয়নমণি, তিনি পিতার ন্যায় সৎস্বভাব বিশিষ্ট, বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রগণ্য এবং অতুল বলশালী।

জগতে যখন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তখন পদ্মাবতীর পুত্রশোক চির-কাল সমভাবে থাকিবে কেন? পদ্মাবতী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ পুত্রশোক-জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছেন—সাধনকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া তাঁহার দুর্ব্বিসহ শোকজ্বালা কতক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সাধনের সুধামাখা মা বুলিতে তিনি যেন অনেকটা শান্তি পান—সাধনও সুশীলা অপেক্ষ ছোট মার নিকট বেশী আনুগত্য স্বীকার করেন।

বাল্যকালে পিতা মাতার গুণেই সন্তান গুণবান এবং তাহাদের দোষেই সন্তান দোষ-সংযুক্ত অর্থাৎ পাপিষ্ঠ হয়, তাই কথায় বলে "পিতৃ-গুণে গুণী পুত্র, পিতৃদোষে দোষী"; বাল্যকালে বাপ মায়ের দোষেই বালক-গণ মন্দ হইয়া যায়—এই জন্য বাল্যকালে তাহাদিগকে অতীব সাবধানে রাখা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য নতুবা তাহাতে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়।

ভীমসিংহ নিজ পুত্রের মঙ্গলের জন্য, তাহার অসৎ সংসর্গ নিবারণ জন্য চিতোরে এক অতি রমণীয় সুবিস্তৃত বিদ্যা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর এবং পরিখা বেষ্টিত করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যালয়, ব্যায়াম শিক্ষার স্থান; যুদ্ধশিক্ষার্থ স্থান সমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, শিক্ষা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন সাধনসিংহ সামান্য দিনের মধ্যেই নানাবিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের একমাত্র শিক্ষা যুদ্ধ-বিদ্যায় তিনি এমন পারদর্শীতা লাভ করিলেন যে চিতোরে তাঁহার সমকক্ষ পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কিন্তু লেখা পড়া শিখিয়া তাঁহার চরিত্র এত চমৎকার হইয়া-ছিল যে, যে তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছে, সে কখনই তাঁহার অমায়িকতার বিষয় ভুলিতে পারিবে না। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত চরিত্র গঠনের আর অন্য উপায় নাই; বিদ্যা-

শিক্ষার উদ্দেশ্যই কেবল মাত্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লাভ, কারণ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র অমূল্য সম্পত্তি। আজ কাল কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্যরূপ, আজকাল বিদ্যা শিখিয়া চরিত্র যতদূর সংশোধিত হউক আর না হউক, কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই হইল, তাহা হইলেই দশজনের নিকট তাহার প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল, এখন বিদ্যা একরূপ অর্থকরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায়! সমাজে আজকাল যথার্থ চরিত্রবান লোকের আদর নাই।

বার্দ্ধক্য দেখিতে দেখিতে আসিয়া মানবকে আয়ত্ত করে, বিশেষতঃ কলিকালের ত কথাই নাই।

* * * * *

কালের কুটিল গতিতে মহারাণা ভীমসিংহ এক্ষণে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছেন। সাধনসিংহই এখন তাঁহার মন-প্রাণ-ধ্যান-জ্ঞান ও একমাত্র নয়নের তারা হইয়াছেন। সাধন নিজের গুণে পদ্মাবতী, সুশীলা এবং প্রজাবর্গ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন।

ভীমসিংহ পুত্রকে উপযুক্ত দেখিয়া একদিন তাহাকে নিকটে আহ্বান করতঃ তাহার নিকট যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার এবং বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। পিতার কথা শুনিয়া সাধনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি সংসার-বন্ধন-রূপ দায় পরিগ্রহ করিবেন না, ইহা তাঁহার আজীবন সংকল্প। কিন্তু পরম পূজনীয় পিতৃদেবের প্রস্তাব কেমন করিয়া অস্বীকার করিবেন, বিশেষতঃ ছোট মা এই সকল কথা শুনিলে কাঁদিয়া আকুল হইবেন, কাজেই প্রবল স্রোতে বাধা পড়িল, মনের গতি অন্যরূপ হইলেও তাঁহার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা রহিল না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া করযোড়ে বলিলেন,—পিতঃ! সংসার-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ কোন্ কালে সুখী হইয়াছে, সংসারেত

সুখ নাই ; তবে কেন আমাকে সংসার জালে আবদ্ধ থাকিয়া চিরকাল দুঃখভোগ করিবার উপদেশ দিতেছেন ?

ভীমসিংহ বলিলেন,—বৎস ! তুমি সংসারী কাহাকে বল, এবং কয়েকজন সাধুপুরুষ ছাড়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কে কোথায় সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে। বৎস ! সংসারের তুল্য আশ্রম আর নাই, আমি অনেক মহাত্মার মুখে একথা শুনিয়াছি। আর দেখ ! শুকদেব, নারদ প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি ছাড়া সকলেই গৃহী, এমন কি যাঁহার দয়ায় এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে ; সেই দয়ার জলধি বিশ্বপতিই কি সংসারী নহেন ? তবে বৎস ! আর অন্য মত করিয়া আমাদের মনে কষ্ট দাও কেন ? সংসারে থাকিয়া সংসারীর নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, সংসার হইতেই পরিত্রাণের উপায় করিতে পারা যায়। তোমাকে একটা সামান্য কথায় উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর,— কোন গৃহে যদি কুলটা স্ত্রী থাকে, সে যেমন সাংসারিক সমস্ত কার্য্য করে, সমস্ত বিষয়েই অন্য লোকের সহ যোগদান করে, কিন্তু তাহার মন সর্ব্বদা সেই উপপতির দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। সংসারে থাকিয়া এরূপভাবে ঈশ্বর সাধনা করিতে পারিলেই, ভগবানে এইরূপ তদ্গত-চিত্ত হইতে পারিলেই, ভোগ মোক্ষ করতল গত হয়। তবে কেন বৎস ! তুমি সংসারের প্রবেশ দ্বারে আসিয়াই ভীত হইতেছ ? দুর্দ্দ-মনীয় ষড়রীপুকে বশীভূত করতঃ দুর্ব্বল-চিত্ত মানবের পক্ষে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করাই বিধেয়।

পিতার বাক্যে সাধন সিংহ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" মহারাণা এইবার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সভার কার্য্যও অদ্যকার মত শেষ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

আজ চিতোর রাজবাটীতে মহাধুম। সাধন সিংহ আজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, চিতোরের আবাল বৃদ্ধ এই সংবাদ শ্রবণে পুলকিত; পদ্মাবতী ও সুশীলার ত কথাই নাই, প্রাণের কুমার সাধন আজ রাজা হইবে, এ সংবাদ শ্রবণ করিলে কোন পুত্রবৎসলা জননী আনন্দানুভব না করেন?

মহারাণা ভীমসিংহ এবং রাণা বংশের কুলপুরোহিত বিদ্যাপতি মহাশয় আজ বড় ব্যস্ত। শিষ্য বাটী কার্য্য হইলে গুরু পুরোহিতের নন্দের সীমা থাকে না, বিশেষ তঃ শিষ্য যদি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিষ্ণু হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। মহারাণা ভীমসিংহের কুলপুরোহিত আজ রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে যথেষ্ট লাভবান হইবেন এই

তাঁহার আনন্দ, এই আনন্দের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া সমস্ত উদ্‌যোগ করিতেছেন।

শুভ সময় উপস্থিত,—প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া রাজসভায় সমবেত হইল। অদ্য রাজসভার অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে; দেখিলে নয়ন সার্থক হয়; নবীন ভূপতির অভিষেক উপলক্ষে সকলে আগমন করিয়াছেন, সভায় লোকে লোকারণ্য। দেশ বিদেশ হইতে অপরাপর রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আজ চিতোর রাজসভায় সমাগত হইয়াছেন। মহারাণা ভীমসিংহ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সাধনসিংহকে অভিষেক করিলেন, চারিদিকে প্রজাবর্গের আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল। আজ নবীন ভূপতি রাজ পরিচ্ছদে সজ্জীভূত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন দেখিয়া সকলের নয়ন সার্থক হইল। পদ্মাবতী ও সুশীলা আজ রাজমাতা হইলেন, পুত্রকে রাজবেশে সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এইবার রাজ পুরোহিত বিদ্যাপতি মহাশয় সভামধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—কুমার সাধন সিংহ এখন আর কুমার নহেন, আজ সমগ্র রাজপুতানার অধিপতি, তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া সকলেই যারপর নাই সুখী হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাকে বিবাহিত দেখিলে আমরা আরও সুখী হইব। পঞ্জাবরাজ আদিত্যসিংহ তাঁহার একমাত্র দুহিতা সরোজিনীকে সাধনসিংহের করে অর্পণ করিতে প্রস্তুত; মহারাণা ও রাজ্ঞিগণের অনুমতি পাইলেই অচিরে মঙ্গল-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সরোজিনী রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী।

সাধনসিংহ বিদ্যাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি পিতা মাতার অনুমতি ক্রমে সংসারী হইতে প্রস্তুত আছি, তবকয়েকদিন অপেক্ষা করিতে হইবে; আমি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করি-

লাম, তখন আমাকে একবার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতে হইবে; প্রজাবর্গ কোথায় কে কিরূপে অবস্থান করিতেছে, আমাকে একবার দেখিতে হইবে, ইহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে গমন করিয়া রাজ্যের অবস্থা দেখিয়া আসিব।

প্রজাগণ সাধনসিংহের প্রজারঞ্জন বিষয়ে একান্ত অনুরাগ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

বিবাহ না করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করা কথনই উচিত নহে; সংসারীর পক্ষে সংসারের প্রধান অবলম্বন, মনোমত স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া সংসারী হওয়াই নিয়ম, তবে কি করিবেন—পিতা মাতার একান্ত অনুরোধে প্রথমতঃ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

সাধনসিংহ মৃগয়াচ্ছলে আপন রাজ্য দর্শনে গমন করিবেন শুনিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সুসজ্জিত হইতে লাগিল। যুবরাজ বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, সকলকে যথাযোগ্য সমাদর করতঃ অন্তঃপুরে জননীর নিকট গমন করিলেন। সুশীলা ও পদ্মাবতী "বাবা! আজ আমরা রাজার মা হইলাম" বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাধনসিংহ জননীদ্বয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন এবং বলিলেন,—মা! আমি কল্য রাজ্য দর্শনে গমন করিব এবং মৃগয়া করিয়া বহুদিনের আশা পরিতৃপ্ত করিব। সুশীলা ও পদ্মাবতীর আনন্দের সীমা রহিল না। ইহার মধ্যে পুত্রের রাজ্যের প্রতি এতদূর মমতা হইয়াছে দেখিয়া, মনে মনে কতই সুখী হইলেন। পদ্মাবতী পুত্রের নিকট নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিলেন—"বাবা! পঞ্চাবপতির হইয়া পুরোহিত মহাশয় যে প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে তুমি সম্মত আছ তো; আমার বিবেচনায় শীঘ্র বিবাহ করিয়া রাজ্য দর্শনে যাইলেই ভাল হইত" সাধনসিংহ বলি-

লেন,—মা! রাজ্যদর্শনে বা মৃগয়া করিয়া ফিরিয়া আসিতে আর কত বিলম্ব হইবে; ফিরিয়া আসিয়াই বিবাহ করিব।

সাধনসিংহ পদ্মাবতীকে অতীব ভক্তি করিতেন, প্রাণ থাকিতে তাঁহার কথার অমর্য্যাদা করিতেন না। পদ্মাবতীও সাধনকে সপত্নী-পুত্র বলিয়া মনে করিতেন না।

উৎসব-কার্য্য শেষ হইয়াছে; যে সকল রাজাগণ দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাণা ভীমসিংহ পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এইবার পরকাল চিন্তার অবসর হইল। এই জন্যই মানব পুত্র লাভের জন্য লালায়িত হয়, এই জন্যই এত কষ্ট সহ্য করিয়া বাল্যকাল হইতে পুত্রকে লালন পালন করে, এইজন্য সন্তানের প্রতি এত মায়া। পুত্র যে আত্মার অংশ, অর্থাৎ আপনি যে পুত্র রূপে পত্নী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হন, এই স্থানেই তাহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়, তারপর "পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্"। এই জন্য আর্য্য-শাস্ত্রে পুত্র লাভের এত গুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

সাধনসিংহ পরদিন প্রভাতে পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, রাজ্য দর্শন ও মৃগয়া করিতে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুকারাগারে।

সাধনসিংহ নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া নিজ রাজ্যের অবস্থা দর্শন করতঃ পুলকিত হইলেন। প্রজাগণ সুখে কালযাপন করিতেছে দেখিয়া রাজার অন্তরে স্বভাবতঃই আনন্দ লাভ হয়। প্রজার সুখ বৃদ্ধির জন্য তখনকার রাজারা প্রাণপণ করিতেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন, প্রজাগণকে সুখে রাখিতে পারিলেই রাজধর্ম্ম পালন করা হইল।

যুবরাজ রাজ্য সন্দর্শন করিয়া পুলকিত অন্তঃকরণে সৈন্য সমভিব্যাহারে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া মৃগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একটী মৃগ দর্শন করিয়া তাহার পশ্চাদানুসরণ করিলেন। মৃগ বন হইতে বনান্তরে ক্রমশঃ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। সাধনসিংহ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। মৃগ ক্রমে এতদূর গমন করিল যে আর দেখিতে

পাওয়া গেল না—নয়ন পথের অতীত হইল। মৃগ গহন কাননে পলায়ন করিল দেখিয়া যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতে লাগিল; কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনরায় মৃগটীকে দেখিতে পাইলেন। এইবার সাধনসিংহের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি হইল; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—সৈন্যগণ তাঁহার নিকটে নাই; তাহারা কোন দিকে গমন করিয়াছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। মৃগ প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল, ক্রমশঃ এমন কণ্টকাকীর্ণ বনে প্রবেশ করিল যে, তথায় মনুষ্যের প্রবেশ একান্ত দুরূহ। রাজকুমার তাহাতে ভীত না হইয়া সেই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজের অঙ্গ ও অশ্বের চারিদিক কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল—অশ্ব জ্বালায় হাঁপাইতে লাগিল;—আর যাইতে পারিল না। সাধনসিংহ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বটীকে একটী বৃক্ষশাখায় বন্ধন করতঃ পদব্রজে মৃগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তথাপি মৃগ বধ করিতে পারিলেন না। রাজপুত্র হইয়া পদব্রজে কানন-ভ্রমণ-ক্লেশ আর কতক্ষণ সহ্য করিবেন। কুমার অবসন্ন দেহে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন। আর পদ হইতে পদান্তরে যাইবার ক্ষমতা নাই; সৈন্যগণ কে কোথায় গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই; তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কি করিবেন—জলাশয় কোন দিকে তাহাও অবগত নহেন! নিকটে আপনার বলিবার কেহ নাই—কেবল ক্ষত্রিয়ের সহচর অসিচর্ম্ম সহায়রূপে নিকটে আছে। কুমার বড়ই বিপদে পড়িলেন; এমন সময় মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে লাগিল। অরণ্যের শীতল বাতাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নিগ্ধ হইতে লাগিল; পিপাসার প্রকোপ কিছু প্রশমিত হইল। এইবার আরামদায়িনী তন্দ্রা আসিয়া রাজকুমারকে অধিকার করিল। দেহ সকল বিষয়ে আরাম না হইলে

নিদ্রার অধিকৃত হইতে পারে না। এক্ষণে সাধন সিংহ শীতল হইয়া নিদ্রার কোমল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িলেন। অধিক পরিশ্রমের পর নিদ্রার আক্রমণ বড়ই মনোহর; কুমার নিদ্রিত হইয়াছেন। পাঠক! অবস্থার কি পরিবর্ত্তন দেখুন, সুধাধবলিত রাজপ্রাসাদে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া যাহার নিদ্রা হইত না, কেবল আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে বলিয়া শত শত দাস দাসী যাহার নিকট করযোড়ে অবস্থান করিত; যাহার কপালে একটুমাত্র স্বেদ নির্গত হইলে সুশীলা ও পদ্মাবতীর কষ্টের একশেষ হইত, শশব্যস্তে ক্রোড়ে লইয়া যাহাকে ব্যজন করিতেন, আজ সেই চিতোর রাজবংশের একমাত্র আশার ধন সাধনসিংহ বনমধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। কুমার পরিশ্রমে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন,—ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন।

এই বন অতি ভয়ানক স্থান—দস্যুদিগের আবাস ভবন। দস্যুগণ দেশ-দেশান্তর হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া এই নির্জ্জন অরণ্যে আসিয়া বাস করে, এই বন-ভূমি মনুষ্য সমাগম শূন্য। মানুষে ইহার গভীরতা দেখিলেই ভীত হয়,—প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়, তা ইহাতে প্রবেশ করা ত পরের কথা। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এই জন্য এখানে নির্ভয়ে মনের আনন্দে বিচরণ করে।

হঠাৎ কতকগুলি দস্যু বনে বিচরণ করিতে করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইল এবং রাজপুত্রকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া আহ্লাদিত অন্তঃকরণে অপরকে বলিল, ভাই! আজকার বন ভ্রমণটা বৃথা যাইবে না—এই দেখ একটী রাজপুত্র নিদ্রায় অভিভূত, চল—ইহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাই। আর একটী দস্যু বলিল—ওরে রমা! সে দিন যে একটী রমণীকে পঞ্জাবের কেলি বন হ'তে ধরে আনা হয়েছে,

শুনছি সর্দ্দার নাকি তাকে বিয়ে কর্ব্বে, তা ভাই হবে না, আমরা সকলে ছেরমো কর্ব্বো, আর সর্দ্দার একা ভোগ কর্ব্বে, তা হ'বে না, আমরাও বখ্‌রা নেবো। রমা বলিল—ভাই! সর্দ্দারের যে রূপ তাতে সে ছুড়ীকে বিয়ে কল্লে বেশ সাজবে কিন্তু, যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ হাস্‌বে, এরূপ সর্দ্দারগিরি কর্ত্তে পারলেও যথেষ্ট লাভ আছে। ছিরে বলিল—ওরে রমা! আর তোকে মজলিসী মারতে হবে না, এদিকে যে শিকার ফোসকে যায়। জেগে উঠলে মুস্কিল হবে; আর বিলম্ব করা ভাল নয়। দস্যু সকল রাজকুমারকে বন্ধন করিয়া ফেলিল এবং অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, নিদ্রিত রাজপুত্রকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে মিলন।

আজ অমাবস্যা তিথি—দস্যুগণের মহা উৎসবের দিন, আজ তাহারা আমোদে মাতিয়াছে। কাহার সর্বনাশ, কাহার পৌষমাস। পাঠক! আসুন—আমরা দস্যু কারাগারে প্রবেশ করি। চারিধারে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত কতকগুলি গৃহ দস্যুদের কারাগার, তৎপার্শ্বে বড় বড় গৃহ তাহাদের থাকিবার স্থান, কারাগারে বন্দীর সংখ্যা নাই বলিলেই হয়; একটী গৃহে একটী যুবক নিদ্রিত, আর একটী গৃহে একটী ষোড়শী যুবতী রূপে যেন কারাগৃহ আলো করিয়া রহিয়াছে। যুবতী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া চিন্তা সাগরে ভাসিতেছেন। যুবতীকে দেখিয়া বোধ হয় কোন উচ্চবংশ সম্ভূতা, অদৃষ্ট-দোষে দস্যু কারাগারে বন্দিনী হইয়াছেন। যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—জননি! আপনার কথার অবহেলা করিয়া অসময়ে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়া; তোমার আদরের সরোজিনীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, একবার দেখিয়া যাও, মা!

তুমি আমার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করিতেছ! কিন্তু এই নির্জ্জন অরণ্যে যে আমি দস্যু কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহাত তুমি জান না তবে মা আমার উদ্ধার হইবে কিসে? আমি চিতোর-রাজকুমার সাধনসিংহের সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া এতদূর উন্মত্তা হইয়াছিলাম যে, তোমার কথা না শুনিয়া সন্ধ্যাকালে পুষ্পচয়নে আসিয়া আমার এই দুর্গতি হইল—হায়! আমার গতি কি হইবে? দুরাত্মারা আমার সতীত্ব নাশ করিবার জন্য যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা ও উৎপীড়ন করিতেছে, আমি একাকিনী রমণী হইয়া আর কতদিন সহ্য করিব। হায়! জগদীশ! হায় মা! পাঞ্জাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমার ভাগ্যে কি অবশেষে এই লিখিয়াছিলে? কিন্তু দেবি! আমিও পাঞ্জাব কেশরীর কন্যা সমর বিশারদ সংগ্রামসিংহের ভগ্নী, দেহে যতক্ষণ তিলমাত্র রক্ত থাকিবে,, ততক্ষণ কার সাধ্য আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সতীত্ব-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে; শেষে যদি একান্তই নিরুপায় হই, তবে দেবি! আমার জীবনের একমাত্র সহায় এই ছুরিকাখানি সঙ্গে আনিয়াছি, ইহারদ্বারাই জীবনের শেষ করিব, পাঠক! আপনারা বনমধ্যে দস্যু-মুখে যে রমণীরত্নের কারারুদ্ধ-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ইনিই সেই রমণী, আমাদের পাঞ্জাবকেশরী আদিত্যসিংহের প্রিয়তমা দুহিতা, অদৃষ্টদোষে আজ দস্যুগৃহে আবদ্ধা।

অনেকস্থলে ক্ষমতা প্রকাশ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দস্যুগণ আজকাল সরোজিনীকে একটু স্বাধীনতা দিয়াছে, আস্তে আস্তে নানা প্রলোভনে তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ফণিনী কি নিজ স্বভাব ভুলিতে পারে?

অদ্য অমানিশা দস্যুগণ উৎসবে মাতিয়াছে—এইজন্য সরোজিনীর উপর সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণের ভার। সরোজিনী শুনিয়াছিলেন—একটী

রাজপুত্রকে দস্যুগণ বন্দী করিয়া আনিয়াছে। সরোজিনী অবসর পাইয়া তথায় গমন করিলেন এবং দ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন, একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য সম্পন্ন যুবক হস্তপদ বদ্ধ হইয়া কারাগারে নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সরোজিনী এই যুবককে দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইলেন, মনে মনে বলিলেন, এই সময় দস্যুরা কেহ গৃহে নাই ; আমি আস্তে আস্তে ইহার বন্ধন মোচন করিয়া দিই না? এই বলিয়া যুবকের বন্ধন খুলিতে লাগিলেন।

স্ত্রীজাতিই জগতের জীবের রক্ষা কর্ত্রী, স্ত্রীজাতির হৃদয় দয়াশূন্য হইলে এতদিন ভগবানের এই অসীম বিশ্ব জীবশূন্য হইত। আজ স্ত্রীজাতির হৃদয় দয়া—প্রবণ না হইলে কি কারারুদ্ধ রাজকুমারের বন্ধন মোচন হইত?

* * * *

সরোজিনী যুবকের বন্ধন খুলিতে আরম্ভ করিলে পর তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চারিদিক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কোথায় আমি ; ছিলাম কাননে, এখানে আসিলাম কিরূপে? আমার অসি কোথায়—চারিদিকে রজ্জু দেখিতেছি, একি? এ রমণীই বা কে?

রাজপুতবীর সাধনসিংহ সরোজিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষসী বিবেচনায় বলিলেন,—"কে তুমি! আর আমাকে এখানে এ অবস্থায় কে আনয়ন করিল, আমার অসি চর্ম্ম কোথায়, যথাযথ পরিচয় দাও, নতুবা ক্ষত্রিয়বীর,—জগৎ বিখ্যাত ভীমসিংহের পুত্র সাধনসিংহের নিকট কোনমতেই নিস্তার নাই।"

সরোজিনী যুবকের বাক্য শুনিয়া এককালে স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ভীত হইয়া বলিলেন,—কুমার! আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না,

তবে এইমাত্র জানি, আমার ন্যায় তুমিও দস্যু কারাগারে বন্দী হইয়াছ?

সাধনসিংহ বনমাঝে আপনার নিদ্রাবস্থার কথা স্মরণ করিলেন এবং নিদ্রিত হইয়া যে তাঁহার এই দুর্গতি হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করিবেন, বিপদে অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। তিনি যুবতীকে দেখিয়া, তাহার সরলতা-মাখা কথা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। দুরাত্মারা এই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনীকে বন্দী করিয়াছে শুনিয়া, একবারে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি অনিন্দিতে! একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের প্রতি তোমার এতাদৃশ দয়া দেখিয়া আমি যার-পর-নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্ত্রীজাতি দ্বারাই যে জগত প্রতিপালিত হইতেছে,—তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিলাম। যাহা হউক, যদি একবার মাত্র একখানি অসি হস্তে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিজের পরিত্রাণের জন্ম কিছুমাত্র চিন্তা করি না, কিন্তু তোমার উদ্ধারের জন্ম আমার চিত্ত একান্ত অধীর হইয়াছে। তুমি কিরূপে বন্দী হইয়াছ, যদি বলিতে বাধা না থাকে, প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। সরোজিনী মনে মনে ভাবিলেন,– এইবার সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কিন্তু কি করি, নিজের উদ্ধারের উপায় করাত একান্ত কর্ত্তব্য; এক্ষণে আমার প্রাণের অভিলষিত বস্তুর দর্শন পাইয়াছি আর চিন্তা কি? এক্ষণে এই রূপ-রাশি হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে মরিতে পারিলেও নারী জন্ম সফল হইবে, ইহা স্থির করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা কুমারের নিকট প্রকাশ করিলেন। সাধনসিংহ সরোজিনীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন—পুরোহিত মহাশয় যে বলিয়াছিলেন "রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী" আজ স্বচক্ষে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মনোনয়নের বিবাদ ভঞ্জন

হইল। এইরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্না রমণীরত্ন লাভ করিতে না পারিলে মানব জন্মই বৃথা। এক্ষণে এই রত্নলাভ করিয়া দস্যু গৃহ হইতে উদ্ধার হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। পরে সরোজিনীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—সরোজিনি! ভীত হইও না, দস্যু গৃহে আমাদের এই মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, নতুবা কোথায় তুমি আর কোথায় আমি, বিনায়াসে এরূপ সংযোগ নিশ্চই দৈব কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে সরোজ তুমি এক কার্য্য কর, যখন তোমার উপর দস্যুগণের একটু বিশ্বাস হইয়াছে, তখন কোনও উপায়ে আমার রাজ-পরিচ্ছদ ও অসি চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই আমরা উভয়ে নিরাপদ হইতে পারিব। এক্ষণে ইহার কি কোন উপায় করিতে পার?

সরোজিনী ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন—তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আমি কল্যই আপনার রাজ পরিচ্ছদ ও অসি চর্ম্ম আনিয়া দিব। যাহার অন্ত দস্যু গৃহে বন্দিনী। যখন সেই প্রাণের একমাত্র দেবতা এই কারা-গারেই লাভ হইল; তখন আর আমার চিন্তা কি? নারীজাতি চিরকালই পুরুষের অধীন, আপনি নিকটে থাকিলে, আমি জগতের কাহাকেও ভয় করি না। নিশ্চয়ই অন্য কৌশলে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিব।

বেলা প্রায় সায়াহ্নের সমীপবর্ত্তী, দস্যুরা এখনি ফিরিয়া আসিবে, আর এখানে থাকা উচিত নয়, ইহা স্থির করিয়া বলিলেন,—"প্রভু! আর বেলা বেশী নাই, দস্যুরা এখনি আসিবে, আমি প্রস্থান করি; অধিনীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।" এই বলিয়া সরোজিনী রাজ-কুমারের প্রতি একবার অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সাধনসিংহ সরোজিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার সাহস দেখিয়া যথার্থ বীর রমণী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহার সেই কোকিলকণ্ঠ বিনিন্দিত-কণ্ঠস্বর, সেই লজ্জাবিজড়িত, প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মুখমণ্ডল যেন সাধনসিংহের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—সংসারী হইতে হইলে এরূপ রমণীকে জীবনের সঙ্গিনী করাই বিধেয়, বিধাতঃ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যু বিজয়।

আজি কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী তিথি। যামিনীর প্রায় দ্বিযাম অতীত হইয়াছে। চন্দ্রদেব পূর্ব্বাকাশ হইতে উদিত হইয়া ক্রমশঃ মধ্যাকাশের নিকটবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিতেছেন। ঘোর রজনীতে বনদেবীও মোহিনী সজ্জায় সজ্জিতা, কানন মধ্যবর্ত্তী দস্যু আবাসে চন্দ্রপ্রভা সুন্দররূপে খেলা করিতেছে—চারিদিকেই জ্যোৎস্না, কোথাও অন্ধকার নাই, রজনীর এই সময়টীই অতীব মনোমুগ্ধকর।

এ হেন সুখের সময়ে দস্যুপতি সরোজিনীর নিকট উপনীত হইয়া, সহাস্য বদনে কহিতে লাগিল—"সরোজ! আর আমাদের বিবাহ হইবার নয়দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা হইলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ব্যাঘ্র নিকটে আসিলে শিকারী যেমন আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সরোজিনীও আজ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—তোমার ত মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার মনের ইচ্ছাত কই পূর্ণ হইতেছে না? দস্যুপতি শশ-

ব্যস্তে বলিলেন—"কেন সুন্দরি! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না। তোমায় অদেয় কিছুই নাই, আমার প্রাণ দিয়াও যদি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি, কি অভিলাষ অধীনের নিকট সত্বর প্রকাশ কর।"

রমণীর কৌশল জাল অতীব ভয়ানক। চতুর-চূড়ামণি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই জালে জড়িত হইয়া একদিন দিশা হারা হইয়াছিলেন। এজালে একবার আবদ্ধ হইলে আর কাহারও পলাইবার ক্ষমতা থাকে না। সরোজিনী দস্যুপতিকে বলিলেন—দেখ তোমার এরূপ অপরূপ রূপ—ইহাতে দস্যু বেশ ভাল দেখায় না, কোমলে কঠিনের সমাবেশ হইলে রূপের বৈলক্ষণ্য হয়। অতএব রাজবেশ পরিধান করিয়া হস্তে অসি চর্ম্ম ধারণ করিলে তোমাকে কেমন দেখায়, আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা হয় না কি?

দস্যুপতি এইবার বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—এই কথা, ইহার আর আশ্চর্য্য কি, এখনই রাজপরিচ্ছদ আনিতেছি। এই বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সাধনসিংহের গাত্র হইতে যে সকল রাজ পোষাক কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহা লইয়া সরোজিনীর নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল—সরোজ! এই দেখ রাজ পরিচ্ছদ আনিয়াছি এইবার পরিধান করি?

সরোজিনী বলিলেন,—এ রাত্রে আর পরিয়া কি হইবে, এখন এই-খানে রাখিয়া যাও, অতি প্রত্যুষে আমার নিকট আসিও আমি স্বহস্তে তোমাকে রাজ ভূষণে ভূষিত করিব? দস্যুপতি সরোজিনীর কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইল, মনে মনে ভাবিল—এইবার সরোজিনী বশীভূতা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ব্রত উদ্‌যাপনের এই কয় দিন অতিবাহিত হইলে বাঁচি, তাহা হইলেই সরোজিনী আমার হইবে। এই

প্রকার লুব্ধ আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া দস্যুপতি সুখের তরঙ্গে ওতপ্রোত হইতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে,—সরোজিনী বলিলেন—আর রাত্রি জাগরণে কাজ নাই, কল্য অতি প্রত্যূষেই আসিও, এই বলিয়া পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত করায়ত্ত করিলেন। দস্যুপতি সেদিনকার বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

সরোজিনী হাসিতে হাসিতে দস্যুপতি প্রদত্ত অস্ত্র শস্ত্র ও রাজপরিচ্ছদ লইয়া কুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাধনসিংহ সরোজিনীর আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া, তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করতঃ বলিলেন—বীরবালে! আর কোন চিন্তা নাই—এখন কাহার সাধ্য আর আমাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারে, এইবার সিংহ জাল কাটিল। এই বলিয়া সমস্ত পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিলেন, কটিতটে অসি বিলম্বিত করিলেন, যেন সাক্ষাৎ শমন সদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কারাগার হইতে বাহির হইলেন, সঙ্গে সরোজিনী।

কুমারের জলদগম্ভীর স্বর শুনিয়া দস্যুপতি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কারারুদ্ধ যুবক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে। দস্যুপতি দেখিয়া অবাক; সরোজিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধান্ধ হইয়া তীব্রস্বরে কহিতে লাগিল -"বিশ্বাস-ঘাতিনি! তোর এই কাজ, আমার সুখশয্যার কণ্টক হইলি, সকল সুখে নৈরাশ করিলি; জানিতাম—সর্পেতেই গরল আছে। এখন দেখিতেছি—নারী জাতি সর্প অপেক্ষাও গরলের আধার। আমি সরল ভাবিয়া স্ত্রীজাতির কথায় বিশ্বাস করতঃ আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিলাম। উঃ আর সহ্য হয় না, এই বলিয়া একটী ভীষণ চিৎকার করিবামাত্র প্রায় ৫০ জন দস্যু লাঠী হস্তে তাহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল; সাধনসিংহ রণ—কৌশলে দস্যুগণকে

পরাজিত করিয়া ফেলিলেন। শেষে ক্রোধান্ধ হইয়া দস্যুপতির শির লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করতঃ বলিলেন,—পাপিষ্ঠ! এইবার তোকে কে রক্ষা করে, জানিস্‌না দুরাত্মন! ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় চিরকাল হইয়া আসিতেছে। সামান্য দস্যু বৃত্তি করিয়া ভাবিয়াছিস্ তোর তুল্য ক্ষমতাবান জগতে আর কেহই নাই, এইবার তোর ক্ষমতা কোথায় রহিল? দস্যুপতি সাধনসিংহের তীব্র বাক্য-বাণ আর সহ্য করিতে পারিল না, উলঙ্গ অসি হস্তে কুমারকে আক্রমণ করিল, কিন্তু সিংহের সহিত শৃগালের সংগ্রাম কতক্ষণ স্থায়ী হইবে? সাধনসিংহের তরবারি আঘাতে পাপিষ্ঠের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। সাধনসিংহের অসিতলে সর্দ্দারকে প্রাণাহুতি দিতে দেখিয়া, অবশিষ্ট কয়েক জন প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। সাধনসিংহ ও সরোজিনী নিরাপদ হইলেন।

* * * *

সরোজিনী সাধনসিংহের রণ-নিপুণতা দেখিয়া সাতিশয় প্রফুল্লিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে বলিলেন—সমর বিশারদ রাজকুমার! আজি নিরাশ্রয়া সরোজিনীকে নিজ বাহুবলে দস্যুগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন দান করিলেন। আজ হইতে দাসী আপনার চরণ তলে বিক্রীত হইল। আজি হইতে সরোজিনী আপনার দাসী হইল। এই বলিয়া কুমারের পদধুলি গ্রহণ করিলেন।

সাধনসিংহ সরোজিনীকে পদধুলি লইতে দেখিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন—সরোজিনি! প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে তুমিই আমার উদ্ধার কর্ত্রী, আমি নহে। এ জীবনে তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া আমিও সুখী হইব, চল এইবার বন হইতে বহির্গত হইয়া তোমার পিতৃরাজ্যাভিমুখে গমন করি।

সরোজিনী যুবরাজের বাক্য শুনিয়া একবারে আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, দস্যু গৃহে তাঁহার এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে। এক্ষণে আনন্দ সহকারে বলিলেন—প্রিয়তম! আর বিলম্বে কাজ নাই, চলুন আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। এই বলিয়া দুইজনে চলিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া কুমার নিজের অশ্বটীকে দেখিতে পাইলেন, অশ্বটি প্রভুকে হারাইয়া অনন্যমনে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিল। সাধনসিংহ অশ্বটীকে প্রাপ্ত হইয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং বলিলেন—প্রিয়তমে! আমি বন আগমন কালীন এই অশ্বটীকে একটী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম। দুরাত্মগণ সেই সময়ে আমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল? এক্ষণে এই দেখ, ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হইয়া সেই অশ্বটীকে পুনরায় মিলাইয়া দিলেন। তাই বলিতেছি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কিছুতেই তাহার পতন হয় না। এক্ষণে অশ্বে আরোহণ করিয়া চল বন অতিক্রম করি। এই বলিয়া সরোজিনীকে সম্মুখে বসাইয়া আপনি তাহার পশ্চাতে বসিয়া অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। শিক্ষিত অশ্ব প্রভু ও ভাবী প্রভুপত্নীকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সাধনসিংহ ও সরোজিনীর পরিচ্ছদ দস্যুরক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। তাঁহাদের দেখিলে বোধ হয় যেন কোন দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে জয়ী হইয়া বীর ও বীরপত্নী একত্র বিহার করিতেছে।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—∞—

তেজসিংহ।

যামিনীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া উষা সতী ধূসর বসন পরিধান করিয়া পূর্ব্বাচলে উদিত হইলেন। চন্দ্রদেব আপনার কর হরণ করিয়া পশ্চিমাচলে লুক্কায়িত হইলেন। এখন আর নক্ষত্রের সে উজ্জ্বল জ্যোতি নাই। খদ্যোতকুল আর অহঙ্কার ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে না। গরবিনী কুমুদিনী পতি-বিরহে নয়ন মুদ্রিত করিল। নলিনী প্রাণপতিকে উদিত হইতে দেখিয়া সোহাগভরে সর-সলিল আন্দোলিত করিতেছে। প্রভাবতীই কুসুমপুঞ্জ দিনমণিকে আগত দেখিয়া কানন মধ্যে হাসিতে লাগিল। নিশা অবসান দেখিয়া ভৃঙ্গদল বহির্গত হইয়া প্রস্ফুটিত কুসুমের অন্বেষণ করিতে লাগিল। এখন আর চক্রবাক চক্রবাকীর সে বিরহ-অবস্থা নাই। তাহারা কাননমাঝারে কতই প্রেমের তান ছাড়িতেছে। নিদ্রা দেবীও দিনমণিকে আগত দেখিয়া,—জগৎ হইতে অপসৃত হইল। নিদ্রা পলাইল,—জগৎ জাগিল।

পাঠক! বহুদিন হইল, আমরা পদ্মাবতীর প্রাণের পুত্রকে সিদ্ধান্তা-শ্রমে ছাড়িয়া আসিয়াছি। আসুন, একবার অদূরবর্ত্তী সিদ্ধান্তাশ্রমে প্রবেশ করি। ঐ দেখুন! একটী যৌবনকোটিনোন্মুখ তাপস যুবক গৈরিক-বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেছে, হৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্র নাই। ঐ দেখ—ব্যাঘ্র যুবকের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাকে কি আপনারা চিনিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের পদ্মাবতীর প্রাণের কুমার, যে তিন দিনের শিশু নিরাশ্রয় অবস্থায় সিদ্ধান্তদেবের তপোবনে আনীত হইয়াছিল। আজি কালক্রমে সেই শিশু যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে।

সিদ্ধান্ত দেব বহু কষ্টে শিশুর লালন পালন করিয়াছেন। বহু কষ্টে তাহাকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া শেষে যুদ্ধ বিদ্যায় এমনি সুনিপুণ করিয়াছেন যে, তাহার সমতুল্য যোদ্ধা বুঝি ধরাধামে দ্বিতীয় নাই। সিদ্ধান্ত দেব সন্তানকে যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় দেখিয়া, দেহে অমিত বল বীর্য্য দেখিয়া, তাহার নামকরণ করিয়াছেন, তেজসিংহ। পাঠক! এখন হইতে আমরা বালককে তেজসিংহ বলিয়া অহ্বান করিব।

* * * *

তেজসিংহ অকুতোভয়ে কানন মধ্যে বিচরণ করেন। এই সুবিস্তৃত কানন-ভূমির তিনিই যেন একমাত্র অধীশ্বর। কানন মধ্যস্থ সমস্ত জীব জন্তুগণ যেন তাঁহার আশ্রিত প্রজা। তিনি তাঁহার পালক পিতা সিদ্ধান্তদেবও বন্য জন্তুগণ ব্যতীত জগতে যে আর কোন প্রাণী আছে, তাহা কখন দেখেন নাই। সিদ্ধান্তদেবও তাঁহাকে অরণ্য অতিক্রম করিয়া লোকালয়ে যাইলে পতিত হইতে হইবে,এইরূপ ভয় দেখাইয়াছেন। এই জন্য তিনি কখন লোকালয় দর্শন করেন নাই। কিন্তু জ্ঞান হইলে মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে কতদিন থাকিতে পারে?

বয়সের সঙ্গে তেজসিংহের জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তেজ-সিংহ ভাবিলেন,—যে দিন পিতা সাধনায় নিযুক্ত থাকিবেন, সেই দিন লোকালয় দেখিয়া আসিব। এই ভাবিয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে সিদ্ধান্ত দেব তপস্যায় নিরত হইলে তেজসিংহ বহির্গত হইলেন। মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি, তেজসিংহ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মায়া আসিয়া ততই তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

আজ মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া তেজসিংহ পালক-পিতা সিদ্ধান্তদেবকে ত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তেজ-সিংহের মন এখন লোকালয় দর্শনে উৎসুক হইয়াছে। তিনি পালক পিতা সিদ্ধান্তদেবের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মদাতা ও গর্ভধারিণী জননী চিতোরে আছেন। তাঁহার পিতা একমাত্র ছত্রধারী রাজা; সিদ্ধান্ত দেব আরও বলিয়াছিলেন, সময় হইলে তিনি স্বয়ং আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় রাখিয়া আসিবেন, কিন্তু কই? তাঁহার ত সময় হয় না এবং আমিও জগতের কিছু অবগত নহি, কেমন করিয়াই বা যাইব? চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই; দেখি স্বচেষ্টায় কতদুর কৃতকার্য্য হইতে পারি। এই বলিয়া ক্রমশঃ গভীর বন মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অরণ্য ক্রমশঃ এত জটিল ভাব ধারণ করিতে লাগিল, যে আর পদ হইতে পদান্তর যাওয়া যায় না; তাহার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। তেজসিংহ বড়ই বিব্রত হইলেন; ক্রমশঃ বৃষ্টি সহ ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া বনভূমি আন্দোলিত করিল। ঝটিকায় কানন মধ্যাস্থিত বৃক্ষ সকল ভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পড়িতে লাগিল। তেজসিংহ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; অন্যদিকে গমন করিলেন। ভীষণ অশনির হৃদয়ভেদী শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে না। কেবল ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলা চপলার ক্ষণিক বিকাশে কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। নির্ভীক হৃদয় তেজসিংহ সহজে ভীত হইবার নয়—ক্রমশঃ চলিতে লাগিলেন।

এইবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। তপস্বী তনয় তেজসিংহ বেলা আর অধিক নাই দেখিয়া তপোবনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু কোন্ দিক দিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমশই বিপথে যাইতে লাগিলেন, শেষে অরণ্য অতিক্রম করিয়া একটী সুবিস্তৃত সুন্দর কেলি—কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাননের চারিধার সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত, চারিদিকে চারিটী বড় বড় প্রবেশ দ্বার, তাপস-কুমার তেজসিংহ এই কাননের শোভা দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন। মনে করিলেন, এ আবার কোথায় আসিলাম এমন মনোমুগ্ধকর কানন ত কখন দর্শন করি নাই। বৃক্ষ সকল কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চারিদিকে নানাজাতীয় সুগন্ধি কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া কাননের কেমন সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছে? ইহাই কি লোকালয়, কই জন প্রাণীর ত দেখা পাইতেছি না, ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে ঝুণু ঝুণু শব্দ হইল, তেজসিংহের কর্ণে এই শব্দ প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, মরি মরি কি মধুর শব্দ, আমাদের তপোবনে কই এমন শ্রুতিসুখকর শব্দ ত কখন শুনি নাই। এই বলিয়া যে দিক হইতে শব্দটী শুনা যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী অপ্সরাবিনিন্দিত সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি পুষ্পচয়নার্থ ফুলের সাজি হস্তে, কাননে প্রবেশ করিয়া এ গাছ সে গাছ হইতে ফুল তুলিতে লাগিলেন। রমণীর লাবণ্য-প্রভায় যেন কেলীকানন আলো-

কিত হইল। তেজসিংহ অবাক, এই অপূর্ব্ব দর্শন, মানস-মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—একি? এই—কি লোকালয়ের মনুষ্য জাতি; বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্য কি এইরূপ প্রাণীর দ্বারা অকীর্ণ; অথবা এই কানন অমরবাঞ্ছিত, স্বর্গীয় দেবতাগণের লীলা নিকেতন। তাই সন্ধ্যা আগত দেখিয়া দেবতা সকল পুষ্পচয়নে বাহির হইয়াছেন। যাহা হউক, আজ দেব দর্শনে জন্ম সফল হইল। এই বলিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ-ভাবে একটী বৃক্ষে আপন পরিশ্রান্ত দেহভার সংযত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমণী মূর্ত্তি পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাপস-কুমারের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, অনিন্দ্য-দেহ-কান্তি সন্দর্শন করিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। মরি মরি এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। ইনি কি কোন দেবতা, শাপগ্রস্ত হইয়া মানবাকারে মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কতশত পুরুষ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমন নয়ন-মনোহর মূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই। গগনের শশধরেও কলঙ্ক আছে; কিন্তু এই অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র কোথা হইতে আজ আমাদের কেলি কাননে উদয় হইয়াছেন? ইচ্ছা হয় এই রূপ চিরকাল আমার নয়ন-গগণে শশধরের ন্যায় ভাসাইয়া রাখি। নারী জাতি চিরকালই রূপের ভিখারী তাই কত শত রমণী জাতি আপনার জীবনকে অবহেলা করিয়া রূপসাগরে ঝাপ দেয়! রমণী অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাপস-কুমারের রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন—ইনি যিনিই হউন না কেন, আজ হইতে আমার হৃদয়ের দেবতা—এই অবধি বলিয়া জিহ্বার অগ্রভাগ দংশন করিয়া বলিলেন—আমি কি করিতেছি; অজ্ঞাতকুলশীল একজন তপস্বী যুবকের প্রতি এত আশক্তি কেন? আবার বলিলেন—কই? মনত কিছুতেই বাধা মানেনা, বরং বলিতেছে, যামিনি! ভয় নাই; ইনিই

তোমার হৃদয়ের দেবতা। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই স্ত্রীমূর্ত্তির নাম—যামিনী।

প্রবল সাগরে ঝড় উঠিলে সাগর-সলিল যেরূপ আন্দোলিত হয়; রমণীর হৃদয়-সমুদ্রের প্রণয়-সলিল তদ্রূপ সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিয়া কাম্যবস্তু কে কোথায় হেলায় হারাইয়া থাকে? যামিনী কোন বাধা না মানিয়া যুবকের রূপ-সাগরে ঝাপ দিলেন; জীবন, যৌবন, প্রাণ, মন সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি কখন বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে এই মূর্ত্তি আমার লক্ষ্যস্থল, এই মূর্ত্তিই আমার প্রাণেশ্বর। লজ্জা ভয় সমস্তই তিরোহিত হইল। যুবকের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! কে আপনি, এই অযোধ্যার রমণী-জননিষেবিত কেলি-কাননে প্রবেশ করিয়াছেন; এখানে ত পুরুষের আসিবার ক্ষমতা নাই?

* * * *

তেজসিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লোকালয়ের আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না, অধিকন্তু রমণীর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন এবং বলিলেন,—আমি লোকালয়ে কখন আসি নাই; এখানকার আচার ব্যবহার আমি কিছুই জানিনা। চিরকাল তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি। সম্প্রতি পালক পিতা সিদ্ধান্তদেবের মুখে শুনিলাম—লোকালয়ে আমার পিতা মাতা আছেন এই জন্য সিদ্ধান্তদেবের বিনানুমতিতে আসিয়া এইরূপ বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে আপনি দেবতা না মনুষ্য আমাকে পরিচয় দিন। যামিনী তাপসকুমারের সরল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—দেব! আমি দেবতা নহি মানবী, অযোধ্যাপতি মহারাজ

বিজয়সিংহের কন্যা নাম—যামিনী। তেজসিংহ এইবার ভগবানের
সৃষ্ট রমনী-মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময়ে কেলী—কাননের দ্বার রক্ষকগণের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনা
গেল। যামিনী আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র গমন
করিলেন। দ্বারবান সকল উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ করিতে
করিতে তেজসিংহকে দেখিতে পাইল, এবং রমণী-জন-নিষেবিত কেলি-
কাননে পুরুষ মূর্ত্তি দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং তাঁহাকে বন্ধন
করিয়া রাজসভায় লইয়া গেল। তেজসিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন
না। বন্ধনাবস্থায় রাজসভায় নীত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ সংবাদ।

চিতোর রাজপুরী আজ অন্ধকার। সাধনসিংহ সৈন্য সহ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার দেখা নাই। সৈন্যগণ সকলেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারাও যুবরাজের কোন সংবাদ বলিতে পারে না। মহারাণা ভীমসিংহ পুত্র-বিরহে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রাণী সুশীলা ও পদ্মাবতী পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইলেন। রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। পুত্র বিহনে আর জীবন ধারণে ফল কি? ইহা ভাবিয়া রাজা ও রাণী জীবন ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কেবল যবনজেতা সোনপতি হামিরসিংহ তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন এবং বলিতেছেন, মহারাজ! আপনি প্রবীণ, অনেক দেখিয়াছেন—তবে এরূপ অধীর হইতেছেন কেন? কুমার কিছু বালক নহেন; তাঁহার বয়স হইয়াছে; রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে অগ্রগণ্য, কয়েক

দিন মাত্র তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করেন কেন? কুমার বোধ হয় কোন কার্য্যের জন্য স্ব ইচ্ছায় স্থানান্তরে গিয়াছেন। শীঘ্র আসিবেন, আপনারা এত উতলা হইবেন না। এইরূপ নানা প্রকারে বুঝাইতেছেন; এমন সময় দৌবারিক আসিয়া একখানি লিপি প্রদান করিল। রাণা ভীমসিংহ পত্রখানি আসিতে দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং বলিলেন, মন্ত্রিন্! দেখত, এই পত্রে প্রিয় পুত্র সাধনের কোন সংবাদ আছে কি না? মহারাণার অনুমতি পাইয়া হামিরসিংহ পত্রাবরণ মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্রখানি এই;—

প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ

চিতোরাধিপতি শ্রীযুক্ত ভীমসিংহ মহারাণা

মান্যবরেষু।

রাজন্! আজ আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি, বিনা আয়াসে যে অধীনের এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমরা কন্যা সরোজিনী দুরাত্মা দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিল। আপনার বীর পুত্র সাধনসিংহ কর্ত্তৃক আমার প্রাণের পুত্রী সরোজিনীর উদ্ধার হইয়াছে, আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার করে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। কুমার স্বীকৃত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া অধীনের ভবনে আগমন পূর্ব্বক এই শুভ বিষয়ে সম্মতীদান ও আগামী শুভলগ্নে শুভ কার্য্য সমাধা করাইলে চির বাধিত হইব, ইতি— অধীন

আদিত্যসিংহ

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া মহারাণা ভীমসিংহ সমস্ত শোক ভুলিয়া গেলেন। আদিত্যসিংহ-তনয়া সরোজিনীর সহিত আগামী শুভ লগ্নে

সাধনের বিবাহ হইবে শুনিয়া, তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং মন্ত্রীকে শুভ কার্য্যের আয়োজন করিতে বলিয়া, পত্রহস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শোকাতুরা পত্নীদ্বয়কে পুত্রশোকে একান্ত অধীর দেখিয়া বলিলেন—রাণি! আর কোন চিন্তা নাই, সাধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শুধু সংবাদ নহে কুমার পাঞ্জাবরাজ আদিত্যসিংহের কন্যা সরোজিনীকে বনমধ্যে দস্যু কারাগার হইতে উদ্ধার করার পর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আগামী শুভদিনে তাহার বিবাহ হইবে, এইজন্য বৈবাহিক আদিত্যসিংহ আমাদিগের অনুমতি চাহিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন এবং আমাদিগকে তথায় যাইবার জন্য মিনতি করিয়াছেন। এই বাক্য শুনিয়া সুশীলা ও পদ্মাবতীর হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। পুত্রের বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিলে কোন জননীর না আনন্দ হয়। শোক সাগর সুখসাগরে পরিণত হইল। রাজ্য মধ্যে এইসুসংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন। মহারাণা ভীমসিংহ পঞ্জাব প্রদেশের আপন ভবন সজ্জিত করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেই স্থান হইতে কুমারের বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল।

মহারাণা ভীমসিংহ শুভ দিনে শুভক্ষণে রাণীদ্বয় ও অসংখ্য লোকজন সহ পাঞ্জাব প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি মহাশয়ও বঞ্চিত হইলেন না। কারণ তিনি এই বিবাহের প্রধান উদ্যোগী! পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় তিনিই এই বিবাহের কথা প্রথম উত্থাপন করেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ পরিণয়।

আজ আমাদের যুবরাজ সাধনসিংহের শুভ বিবাহের দিন। পাঞ্জাব রাজধানী আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ; বৃক্ষ পত্র ও পুষ্পমালা পরিধান করিয়া রাজ অট্টালিকা সকল মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। লাল, নীল, পীত পতাকা সকল বায়ু ভরে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া যেন আনন্দের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। সৈন্যগণ নানাবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র হস্তে রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাজধানী আলোক মালায় সজ্জিত হইল; রাজোচিত সমারোহে সাধনসিংহ বরবেশে রাজ সভায় উপনীত হইলেন। বিবাহের মহাধুম পড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের সেই শুভ লগ্ন উপস্থিত হইল; পাঞ্জাব কেশরী আদিত্যসিংহ আপন প্রাণের এক মাত্র দুহিতা সরোজিনীকে

বীরবর সাধনসিংহের করে সমর্পণ করিয়া সুখী হইলেন। বহুমূল্য যৌতুক সহ সালঙ্কারা রমণীরত্ন লাভ করিয়া সাধনসিংহও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। সরোজিনী ও সাধন সিংহ একাসনে উপবিষ্ট হইলে যেন মদন ও রতির একত্র মিলন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইলে বর কন্যা বাসরে নীত হইল, বাসরের আসর আলো করিয়া কত শত পুরাঙ্গনাগণ রাজকুমারের সহ রঙ্গরসে মত্ত হইলেন। নর্ত্তকীগণ নানাবিধ সুরলয়ে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। বামাকণ্ঠের সুমধুর কণ্ঠস্বরে বাসরের আসর মুখরিত হইল। রাজকুমার বিমোহিত হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন।

সুখের সময় দেখিতে দেখিতে অতীত হইয়া যায়। শুভ বিবাহের শুভ রজনী হাসিতে হাসিতে প্রভাত হইয়া গেল। বাসী বিবাহের পালা পড়িল। আদিত্যসিংহ বরকন্যা বিদায়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার সাধের কন্যা স্নেহরূপিণী সরোজিনীকে বিদায় দিতে হইবে, যাহাকে এতদিন ধরিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন; যে কন্যাকে না খাইয়া খাওয়াইয়াছেন, যাহাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন; আজ সেই সরোজিনী পরের হইল, আর তাহার উপর কোন প্রভুত্ব খাটিবে না, আজ তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় দিতে হইবে, এই ভাবিয়া রাজা ও রাণীর প্রাণ আকুল হইল, কিন্তু কি করিবেন কন্যা রত্ন ত আর চিরকাল ঘরে রাখিবার নয়, এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা হইল; মহারাণা ভীমসিংহ লোকজন সমভি-ব্যাহারে বৈবাহিক বাটীতে আগমন করিলেন; বিদায় কালীন উভয়ে আলিঙ্গন করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া মহারাণা মহাসমারোহে আপন ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কতশত অন্ধ খঞ্জ দীন দুঃখীর যে এই বিবাহে অভাব মোচন হইল, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

বর ও কন্যা ভীমসিংহের পঞ্জাবস্থিত রাজপ্রাসাদ সমীপে উপনীত হইলে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইল, তোরণদ্বারে নবরাগে নহবৎ বাজিতে লাগিল, রাণী সুশীলা ও পদ্মাবতী আসিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ ক্রোড়ে করিয়া সানন্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া আজ তাঁহারা চক্ষের সার্থকতা ও জন্ম সফল বিবেচনা করিলেন।

সুস্থ ও সবলকায় মানবের পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারী হইতে হইলে, স্ত্রী না হইলে চলে না, স্ত্রীজাতিই সংসারের সার রত্ন। মনোমত নারীরত্ন নির্ব্বাচন করিয়া জীবনের সঙ্গিনী করিতে পারিলে, সংসারে কোন অমঙ্গলই স্থান পাইতে পারে না; স্ত্রীজাতির গুণে এককালে সকল অমঙ্গল তিরোহিত হইয়া সংসার সুখের নিদান স্বরূপ হয়। ভগবদ্‌চিন্তা ভিন্ন সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই; তবে সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় মানব আত্মহারা হয়, সে সুখ কেবল চপলাবৎ অথবা সুখের দ্বারা গিল্‌টি করা দুঃখমাত্র—ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুবর্ণের গিল্‌টি করা পিতলের গহনা যেমন কিছুদিন ব্যবহার করিলেই তাহার নিজত্ব প্রাপ্ত হয়, সংসারে সুখের গিল্‌টি করা দুঃখ ও তদ্রূপ, কিছুদিন পরেই আপনার মহিমা প্রকাশ করে। এই সংসার বড়ই ভয়ানক স্থান, পদে পদে এখানে মানবকে পরীক্ষা দিতে হয়; ইহার ন্যায় পরীক্ষার স্থান আর নাই। ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলে তবে এই সংসারে জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং এই সংসারে পরীক্ষা দিতে হইলে পতিব্রতা রমণী রত্নই তাহার প্রধান সহায়, এইজন্য সংসারীর পক্ষে বিবাহ কার্য্যই প্রধান সংস্কার। আজ সেই জন্যই সাধনসিংহ পিতার অনুমতিক্রমে নির্ব্বাচিতা সরোজিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের সমস্ত উৎসবই সমাধা হইয়া গিয়াছে। সরোজিনী এখনও স্বামীসহ মহারাণার পাঞ্জাবস্থিত রাজ প্রাসাদেই বাস করিতেছেন। সরোজিনী আপনার গুণে শ্বশুর শাশুড়ীর এতদূর প্রিয়পাত্রী হইয়াছেন, যে তাঁহারা বধুমাতাকে একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না; আর সাধনসিংহের ত কথাই নাই। সাধন ও সরোজিনী যেন দুইটীতে এক বস্তু, যেন এক বৃন্তে দুইটী কুসুম—মহারাণার সংসার কাননে প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে।

মহারাণা ভীমসিংহ এখন একপ্রকার সাংসারিক সকল চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, এখন তাঁহার উপরই সমস্ত ভার; যাহা কিছু করিতে হইবে, যাহা করিলে ভাল হয়, যুবরাজ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, সমস্ত যথাবিধানে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

বহুদিন হইল পাঞ্জাবে আসিয়াছেন, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আর এখানে থাকা ভাল দেখায় না, মহারাণা স্বরাজ্যে যাইবার দিন করিতেছেন। এমন সময়ে বৈবাহিক মহাশয় একখানি পত্র হস্তে করিয়া মহারাণার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদিত্যসিংহকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। আজ আদিত্যসিংহের অবস্থা দেখিয়া ভীমসিংহ বিস্মিত হইলেন, তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘন ঘন নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। মহারাণা ইহার কোনও কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই আদিত্যসিংহ! আজ তোমার এরূপ ভাব দেখিতেছি কেন? আদিত্যসিংহ ভীমসিংহ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—ভাই! দুরাত্মা বিজয়সিংহ আমার অপমানের একশেষ করিয়াছে; পুত্র সংগ্রামসিংহ ত এখনি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ইয়াছে। তবে আপনি উপস্থিত থাকিতে হঠাৎ কোন একটা

কার্য্য করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিবেন। তবে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনার মত লইয়া কার্য্য করা উচিত, এইজন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে ইতি কর্ত্তব্য স্থির করুন।

ভীমসিংহ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন কি হইয়াছে অগ্রে বল তার পর ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিব।

আদিত্যসিংহ বলিলেন আজ মাসাবধি হইল অযোধ্যাধিপতি বিজয় সিংহের কন্যা যামিনীর সহিত আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, ইহার জন্য সকল প্রকার উদ্‌যোগ ও হইয়া গিয়াছে; উভয় পক্ষেই মতামত নির্দ্ধারিত হইয়া এক প্রকার বিবাহের আয়োজন ও হইয়াছে, স্থানে স্থানে আমি নিমন্ত্রণের পত্রাদি ও প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে ক্ষত্রিয় কুলগ্লানি দুরাত্মা বিজয়সিংহ এ বিবাহে কন্যার মত নাই, সে এই বিবাহের, নাম শুনিয়া অবধি ক্রমশই ম্রিয়মাণ হইতেছে, ইত্যাদি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া বিবাহ হইবে না—বলিয়া এই পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে ইহার উপায় কি স্থির করুন, বলিয়া বিজয়সিংহ প্রেরিত পত্র খানি মহারাণার হস্তে প্রদান করিলেন।

মহারাণা এই গোলযোগের কিছুই মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেন না, ক্রমশঃ এই কথা অন্তঃপুর মধ্যে রাষ্ট্র হইল, সরোজিনী শুনিলেন, পরে সাধনসিংহ পিতৃসম শ্বশুর মহাশয়ের এতাদৃশ অপমান সূচক ঘটনা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন-পিতঃ দুরাত্মা মনে করিয়াছে, আদিত্যসিংহের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই, এই জন্য তাহার এতদূর সাহস হইয়াছে, আপনি পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া দিন, যখন সমস্ত ধার্য্য হইয়াছে, তখন বিবাহ দিতেই হইবে, বিবাহ না হইবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে পারিলে তবেই ক্ষমা

করিতে পারি, নচেৎ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে বাধ্য হইব, এইযুদ্ধে মহারাণা ভীমপরাক্রম ভীমসিংহের পুত্রও সৈন্যগণ সহ আমার পক্ষ হইবেন।

মন্ত্রী হামির সিংহ সম্মুখে ছিলেন, তিনি যুবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—রাজন্! কুমার ঠিক বলিয়াছেন, পত্রের এইরূপ উত্তর দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ভীমসিংহও আর কোন কথা না বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। উক্ত মর্ম্মের আর এক খানি পত্র অযোধ্যাধিপতির নিকটে প্রেরণ করা হইল।
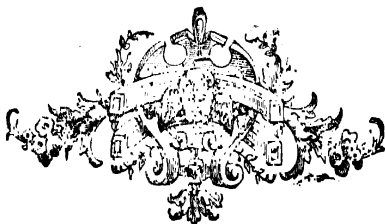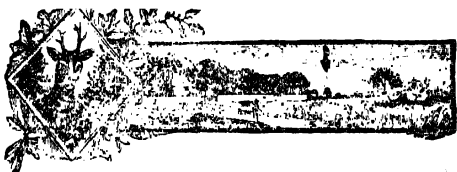
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্র প্রাপ্তি।

পাত্রের সহিত পাত্রী সমকক্ষ না হইলে, উভয়ের মনের মিলন না হইলে, পাত্রস্থ করা বিধেয় নহে। উভয়ের মধ্যে একের অমতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলে, সে মিলন সুখকর হইবে না, সে বিবাহের ফল নিশ্চয়ই বিষময় হইবে, তাহাতে নিশ্চয়ই পরিণামে গরল উত্থিত হইবে, ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এ সকল ভাগ্যাধীন বিষয়ে জোর করিয়া কোন কার্য্য করিতে গেলেই বিভ্রাট হইবে। এরূপ অপরিণাম-দর্শিতা দোষে কতশত সোণার সংসার যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কত গৃহস্থাশ্রম যে ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? বল পূর্ব্বক রমণীসমুদ্র মন্থন করিতে গেলেই তাহা হইতে বিষম হলাহল উত্থিত হইবে, তখন কাহার সাধ্য ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

বিজয় সিংহ বুঝিয়াছিলেন, সংগ্রামসিংহের সহিত পরিণীতা হইতে যামিনীর আদৌ ইচ্ছা নাই: পূর্ব্বে বরং সংগ্রামসিংহের সহিত বিবাহের

কথা উঠিলে অৰ্দ্ধ ইচ্ছা অৰ্দ্ধ অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, এক্ষণে তাপস-বেশধারী ভস্মাচ্ছাদিত অংশুসম ঋষিকুমারকে দেখিয়া আর কোন প্রকারেই সে এ বিবাহে মত প্রদান করে না, কেবল বলে যখন তপস্বী-তনয়কে দেখিয়া আমার মন প্রাণ এত চঞ্চল হইতেছে, তখন উনি নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয় তনয়, আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নতুবা আমার মন প্রাণ এত উৎসুক হইয়াছে কেন? যামিনীর মনে ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস, আমি সেদিন যামিনীর সহচরীর মুখে এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। বাস্তবিক আমার যামিনী ত কখন অবাধ্য নয়, নিশ্চয় ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে; নতুবা ভগবান ঠিক সময়ই তাপস কুমারকে এখানে আনিয়া দিবেন কেন? কেনই বা দ্বারবান কর্ত্তৃক বন্দী অবস্থায় যুবক রাজসভায় আনীত হইবে। ধন্য ভগবান! তোমার ইন্দ্রজাল; যোগীগণ যোগাসনে অহরহ তপস্যা করিয়াও যাহার কণিকা মাত্র মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হন না, আমি কীটানুকীট হইয়া কেমনে এই সকল দুরূহ ব্যাপার উপলব্ধি করিব। যাহা হউক জগদীশ! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার কি ক্ষমতা যে বিধিলিপি খণ্ডন করি, অতএব "ত্বয়া ঋষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" প্রভু! আমি নিমিত্ত মাত্র, তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালিত হউক, তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যেরূপ ভাবে আমাকে পরিচালিত করিবে, আমি সেইরূপেই চালিত হইব; ভগবান! প্রাণের যামিনী যেন আমার স্বামী সুখে সুখিনী হয়।

অযোধ্যাপতি মহারাজ বিজয়সিংহ যামিনী সংক্রান্ত এইরূপ নানা বিষয়ের চিন্তা করিয়াছেন, একটীর পর একটী তারপর আর একটী চিন্তাস্রোত আসিয়া বিজয়সিংহের চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে, এমন সময় জনৈক দ্বারবান আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল—মহারাজ

বন্দী যুবক বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, কিছুতেই তাহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিতে পারা যাইতেছে না, তেমন যে সুকঠিন লৌহশৃঙ্খল তাহা অনায়াসে ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে; বোধ হয় কারাগৃহও ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিবে, এক্ষণে মহারাজের কি অনুমতি হয়? বিজয় সিংহ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যুবকের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া মনে মনে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। যুবককে যে আর বন্দী অবস্থায় রাখা উচিত নয়; তাহা বুঝিতে পারিয়া দ্বারবানকে অনুমতি করিলেন—জিৎসিংহ! তুমি যুবকের বন্ধন খুলিয়া রাজসভায় আনয়ন কর। "যথা আজ্ঞা প্রভু"! বলিয়া জীৎসিংহ প্রস্থান করিল। বিজয়সিংহ মনে করিলেন—যামিনী মনে করিবে কি, আর যুবককে এরূপ ভাবে রাখা ভাল দেখায় না, ভবিষ্যৎ গর্ভে কি নিহিত আছে, কে

* * * *

বলিতে পারে। যাহা হউক, যুবককে দেখিয়া অবধি শুধু যামিনী কেন, আমার অন্তঃকরণ অবধি স্নেহ রসে আপ্লুত হইয়াছে। যুবকের রূপ, গুণ, ক্ষমতা, ও শারিরীক গঠন পারিপাট্য দেখিলে কখনই তাহাকে ঋষিকুমার বলিয়া বোধ হয় না, জানি না ভগবানের মনে কি আছে, কিন্তু এই যুবককে জামাতা রূপে পাইলে যে আমি ধন্য হইব, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিজয়সিংহ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ যুবককে লইয়া রাজ সভায় প্রবেশ করিল। সভাস্থ সকলে যুবকের রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এইবার মহারাজ যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"যুবক! তোমার হৃদয়ে কি ভয়ের লেশমাত্র নাই, তুমি রাজকারাগারে বন্দী হইয়াও এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিতেছ কেন; তোমার কি কিছুমাত্র প্রাণের মায়া নাই?"

যুবক তেজসিংহ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, রাজন্! পিতা সিদ্ধান্তদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম—রাজা এক [illegible]ার ভগবানের অবতার, সকলের পূজনীয় ও মান্যার্হ কিন্তু আমি [illegible]কাল লোকালয়ের কোন বিষয়ই অবগত নহি, রাজ দর্শনও [illegible]জীবনে ঘটে নাই। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি বিনা [illegible] সেই সর্ব্বজনপূজিত, লোক-পালক, দণ্ড মুণ্ডের একমাত্র [illegible] রাজ দর্শন করিলাম। আমি লৌকিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া যদি কিছু দোষ করিয়া থাকি, নিজগুণে আমার সে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; আর আপনি যে বলিতেছেন "তোমার হৃদয়ে কি ভয়ের লেশমাত্র নাই" বাস্তবিক আমি বাল্যকালাবধি পরম যোগী সিদ্ধান্তদেবের আশ্রমে প্রতিপালিত, ভয় কাহাকে বলে জানি না, এ জীবনে একটী দিনের জন্য ভয় বলিয়া কোন জিনিস আমি হৃদয়ে উপলব্ধি করি নাই। হৃদয়ে পাপ থাকিলেই ভয়ের সঞ্চার হয় এবং সেই ভয় হইতেই মৃত্যু আসিয়া মানবকে করায়ত্ত করে, ভয়ের অপর একটী নামই মৃত্যু; ভয় ও মৃত্যু দুইই এক পদার্থ, মৃত্যু না থাকিলে ভয় বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতেই পারে না, জীবের যদি মৃত্যুভয় না থাকে, তাহা হইলে তাহার জগতে ভয়ের কি কোন কারণ আছে? মহারাজ! আমরা তাপস বালক, চিরকাল যোগীশ্বর সিদ্ধান্তদেবের আশ্রমে প্রতিপালিত, আমরা মৃত্যুভয় করি না, যখন জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখন মৃত্যুর জন্য ভয় কি? অতএব আমার হৃদয় ভয় শূন্য, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যে দুরভিসন্ধি আসিয়া মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব শূন্য করে, আমাদের হৃদয়ে সেই সকল দুষ্প্রবৃত্তি তিলেকের জন্যও স্থান পায় না, এইজন্য পিতার তপোবনে আমি সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত একত্র খেলা করিয়াছি। তাপসের কথা শুনিয়া বিজয় সিংহের চৈতন্যোদয় হইল,

তিনি মনে মনে বলিলেন—আমি কাহাকে বন্ধন করিয়া কারাগারে রাখিয়াছি; যুবকের যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, ইনি যে মহাযোগী। পরে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—তাপস কুমার! এই কয় দিবস কারাগারে থাকিয়া ত আপনার কোন কষ্ট হয় নাই?

তাপস-কুমার বলিলেন, রাজন! সুখ দুঃখ আমরা ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করিনা, সুখ দুঃখ দুই এক, আলো না থাকিলে যেমন অন্ধকারের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুখ না থাকিলে দুঃখের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য; আলো অন্ধকার, সুখ দুঃখ সমস্তই এক, একের বিহনে অপরটী কখনই থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখুন, শুক্লপক্ষেও অন্ধকার আছে, কৃষ্ণ পক্ষেও চাঁদের আলো আছে; উভয়েই মেশামিশি ভাব, সুখ দুঃখ ঐরূপ জানিবেন,—মহারাজ! বলুন দেখি, আপনি অতুল ধনের অধিপতি হইয়াও দুঃখের হস্ত হইতে কি কখন পরিত্রাণ পাইয়াছেন? আর আপনি যে কারাগারের কথা বলিতেছেন—মহারাজ! এত লৌকিক কারাগার, লোকের কারাগার কি আবার কারাগার, মহারাজ! আপনি রাজ বুদ্ধি সম্পন্ন, ভাল স্থির চিত্তে বিবেচনা করুন দেখি; ভবকারাগারে যে আমরা আজীবন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; সে যন্ত্রণা অপেক্ষা আপনার অকিঞ্চিৎকর কারা যন্ত্রণা কি অসহ, না সে যন্ত্রণার নিকট ইহার তুলনা হয়, একবার আপনার মনকে বিষয় চিন্তা হইতে অপসারিত করিয়া ভাবুন দেখি, ভব কারাগারে জীবগণ কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে?"

এই অসীম ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানোপদেশে বিজয়সিংহ একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার নিকট আরও নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য বলিলেন—যুবক! আপনার বিবাহ হইয়াছে কি? কোন মহাত্মার ঔরসে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহাদের

নাম কি? যোগীশ্বর সিদ্ধান্তদেব এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতে-ছেন? এই সকল বাক্যের যথাযথ উত্তর প্রদানে আমার কৌতুহলা-ক্রান্ত চিত্তকে সুস্থির করুন।

তাপস-কুমার তেজসিংহ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আমি পিতামাতার নাম জানিনা, সিদ্ধান্তদেব যে আমার পালক পিতা এই মাত্র জানি; পূজনীয় পালক পিতা ও আমি ভিন্ন জগতে যে অসংখ্য নরনারী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি যে ক্ষত্রিয়সন্তান, তাহা একদিন পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম; যেই দিন মধ্যাহ্ন সময়ে জগতের সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য আমার ইচ্ছা হয়, সে দিনই তপোবন হইতে বাহির হইয়া আপনার কেলিকাননে আসিয়া আবদ্ধ হই, কেবল সেই দিন মাত্র আমি একটী রমণী রত্নের দর্শন লাভ করিয়াছি, পূর্ব্বে আর কখন স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করি নাই। সিদ্ধান্তদেব এক্ষণে অরাবল্লীপর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গস্থিত তপোবনে বাস করিতেছেন; আমার অদর্শনে হায়! তাঁহার কত কষ্টই হইতেছে,— মহারাজ! আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি অদ্যই আশ্রমে গমন করিব।

"যুবক ক্ষত্রিয় সন্তান" এই কথাটী মহারাজের অন্তরে যেন প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ে এইবার সকল আশার সঞ্চার হইল; মনে মনে করিলেন, এইবার সিদ্ধান্তদেব দর্শনে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইব, এরূপ স্থির করিয়া বলিলে—চিন্তা কি যুবক? আমি ত আর আপনাকে বন্দী দশায় রাখিব না, আপনি যখন লোকা-লয়ের সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ তখন কিয়দ্দিন এইখানে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করুন, পরে ইচ্ছা হইলেই চলিয়া যাইবেন, আমার তাহাতে কোন বাধা নাই; আমিও আপনার সহিত যোগীবরের চরণ দর্শনে গমন করিব।" বিজয়সিংহ এক্ষণে আপন দুহিতাকে তেজসিংহের করে

সমর্পণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কেবল সিদ্ধান্তের নিকট একবার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। রাজা আজ হইতে অন্তঃপুরে যুবকের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যামিনীর আশালতাও মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। তিনি যাঁহাকে দেবতা সাক্ষ্য করিয়া প্রাণের অধীশ্বর করিয়াছিলেন আজ তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল, তাঁহাকে সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইবেন বলিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগি[illegible]।

বিজয়সিংহ তাপস-কুমারকে আপনার [illegible] জামাতা জ্ঞানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সভা ভঙ্গের অনুমতি দিলেন, এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল—মহারাজ! পাঞ্জাব হইতে দূত পত্র লইয়া আসিয়াছে, দ্বারে দণ্ডায়মান, মহারাজের কি অনুমতি হয়?

বিজয়সিংহের মুখ ম্লান হইল, পাঞ্জাব হইতে পত্র লইয়া দূত আসিয়াছে শুনিয়া, তিনি যেন কথঞ্চিৎ বিমনা হইলেন, তাঁহার সুখ স্রোতে বাধা পড়িল; যামিনীকে তাপস-কুমারের করে সম্প্রদান করিব বলিয়া ভাবি সুখ-আশার যে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, দৌবারিকের মুখে দূত আসিয়াছে শুনিয়া, যেন সে সুখস্বপ্ন কোথায় তিরোহিত হইল। কি করিবেন, দৌবারিককে বলিলেন—দূতকে আসিতে দাও। অনুমতি পাইবামাত্র দূত সভাস্থলে আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া পত্র প্রদান করিল। বিজয়সিংহ পত্র পাঠ করিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন। যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই হইল; আদিত্যসিংহ, সংগ্রামসিংহ, চিতোর রাজপুত্র সাধনসিংহও তাঁহার সেনাপতি সহ সদলবলে যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের সাহসই সহায় যুদ্ধই তাহাদের কার্য্য; এ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে সকলে কাপুরুষ বলিবে, তাই জন্য তিনি অধৈর্য্য না হইয়া, মন্ত্রীকে যুদ্ধ সজ্জার আয়োজন

করিতে বলিয়া. একখানি পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, ক্ষত্রিয় বীর কখন যুদ্ধের জন্য ভীত নহে ; বিজয়সিংহ এত কাপুরুষ নয় যে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া, তাহার কন্যাকে দস্যুগণ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে ; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিতে কাহার সাধ্য যামিনীকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যায়, আমি যুদ্ধে প্রস্তুত আছি"। এইরূপ পত্র লিখিয়া দূত বিদায় হইল, এদিকে যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল ; বিজয়সিংহ আর বিলম্ব না করিয়া সমর সজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য এবং রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয় সঞ্চার।

মহৎ উপাদান হইতেই মহতের উদ্ভব, পাংশুভূমে কখন সারবান বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না। যে যে উপাদানে গঠিত কালে তাহাকে সেইরূপ হইতেই হইবে—ইহাই ভগবানের। লীলা তেজসিংহ যদিও বাল্যকাল হইতে ঋষি আশ্রমে প্রতিপালিত; যদিও তেজসিংহের অন্তঃকরণ এতদিম পরমার্থ তত্বের অন্বেষণ করিতেছিল, যদিও তিনি এতদিন সাধু সহবাসে কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যে যাহা আছে, তাহার খণ্ডন কে করিবে? আজ রমণী কটাক্ষ তেজসিংহের সর্ব্বনাশ করিল আজ যামিনীর রূপজমোহে অভিভূত হইয়া আজীবন তাপসাশ্রমে প্রতিপালিত তেজসিংহেরও পতন হইল। হায়! রমণী কটাক্ষ? তোমার অসীম ক্ষমতা, তুমি যোগীকে যোগভ্রষ্ট করিতে পার, সংসার বিরাগী মহাপুরুষকেও পাতিত করিতে পার; তুমি আবার সংসারীকেও বনবাসী করিতে পার, তোমার তুল্য ক্ষমতা জগতে আর কাহার

আছে? তাই বলি প্রণয় যাহার হৃদয়ে একবার মাত্র প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, রমণী কটাক্ষশরে যিনি একবার মাত্র বিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই জানেন—এ শর—সন্ধান কি ভয়ানক, মানুষ এ শরে বিদ্ধ হইলে কিরূপ হইয়া যায়। আমাদের তেজসিংহ আজ সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি সাংসারিক মায়ায় জড়ীভূত হইয়া এখন রাজ অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন যামিনীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে; আর যামিনীর ত কথাই নাই; একদিন মাত্র দর্শনেই যামিনী তন্ময় হইয়াছে, তেজসিংহ—গতপ্রাণা হইয়া এককালে তাহার করে জীবন যৌবন সমস্ত প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

তেজসিংহ একদিন আহারাদি করিয়া একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে যামিনী আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; যামিনী প্রস্ফুটিত পঙ্কজ সদৃশ মুখমণ্ডল অদ্য ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে; মুখই হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ, যামিনীর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আজ যেন তাহার অন্তঃকরণ একটী দুর্ব্বিসহ চিন্তা সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তেজসিংহ যামিনীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যামিনি! আজ তোমার মনে স্ফূর্ত্তি নাই কেন, মুখমণ্ডল এরূপ বিমর্ষ ভাব ধারণ করিবার কারণ কি?

যামিনী তেজসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বীরবর! আপনি কি আমাদের ভাবি অমঙ্গলের বিষয় কিছু শ্রবণ করেন নাই?

তেজসিংহ বলিলেন—না যামিনি! আমি কিছুই অবগত নহি।

যামিনী হৃদয় দেবতার নিকট আমূল সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন বোধ হয় কল্যই পিতা যুদ্ধার্থ সসৈন্য সমরাঙ্গনে গমন করিবেন। এই বলিয়া নতমুখে নীরব হইলেন। তেজসিংহ প্রণয়িণীকে এতাদৃশ মলিন ভাবাপন্ন দেখিয়া, রহস্যচ্ছলে বলিলেন, যামিনী!

দেখ দেখি, তুমি কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ; সামান্য তাপসের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া কি বিভ্রাট ঘটাইলে, সংগ্রাম সিংহের সহিত প্রণয় স্থাপন করিলে তুমি আজীবন সুখী হইতে পারিতে, আমার ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীল পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়া বাস্তবিকই তুমি লাভে মূলে হারাইলে —ক্ষতিগ্রস্ত হইলে।

* * * *

যামিনী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন—যুবক! ধন থাকিলেই কি প্রণয়ের পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায়? ধন ত পার্থিব সামগ্রী, প্রণয় যে অপার্থিব ধন, ধনের সহিত কি ইহার বিনিময় হয়? আর অতুল ধনের অধীশ্বর অযোধ্যাধিপতি বিজয়সিংহের দুহিতা কখন ধনের আশা করে না, ধনের জন্য সে অপাত্রে আপনার প্রণয় স্থাপন করিয়া পরকাল নষ্ট করিতে পারিবে না। সতীকুল সীমন্তিনী সাবিত্রী ধনের জন্য কাননবাসী সত্যবানকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন নাই? যামিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তেজসিংহ আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না; মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ক্ষণিক নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে যামিনীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—যামিনি! প্রিয়তমে! চিন্তা কি!—কাহার সাধ্য সিংহের নিকট হইতে সিংহিনীকে অপহরণ করে; ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে কাহার সাধ্য তোমার কেশস্পর্শ করে বা তোমার পিতার অনিষ্ট করে? আমি সিদ্ধান্ত দেবের নিকট যেরূপ যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিয়াছি, তাহাতে স্বয়ং কৃতান্ত আসিলেও রক্ষা নাই; আমি তোমার পিতার সহ সিদ্ধান্তের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিব; দেখি সংগ্রামসিংহ কিরূপে যুদ্ধে জয় লাভ করে। এইরূপে উভয়ে নানাপ্রকার কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে কে ডাকিল—মা যামিনি!

বেলা যে অনেক হয়েছে; আহারাদি কর না! যামিনী জননীর কণ্ঠ-স্বর বুঝিতে পারিয়া যুবকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। যামিনীর কথায় ক্রোধান্ধ হইয়া তেজসিংহ যুদ্ধে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ ভূমি।

দুইটী কারণে যুদ্ধ হইয়া থাকে, হয় রমণী না হয় মেদিনী। এই দুয়ের এক লইয়াই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, ইহারই জন্য এত রক্তপাত করিয়া রাজাগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করেন। পাঠক! মহাভারতে যে যুদ্ধের বিষয় পাঠ করিয়াছ, তাহা কেবলমাত্র-মেদিনী লইয়াই সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধের ইতিবৃত্ত লইয়াই মহাভারতের ন্যায় একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন যদি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া বিনা যুদ্ধে সুচ্যাগ্র মেদিনী পাণ্ডবগণকে প্রদান করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা না করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধও হইত না, আর সেই যুদ্ধের ইতিহাস স্বরূপ মহাভারতের সৃষ্টিও হইত না। ত্রেতাযুগে একমাত্র সীতাদেবীকে লইয়াই রামায়ণের সৃষ্টি, দুরাত্মা রাবণ যদি কামান্ধ হইয়া সতীকুল সীমন্তিনী, আদর্শ চরিত্রা সীতাদেবীকে হরণ না করিত, তাহা হইলে রাম রাবণের যুদ্ধ হইত

না এবং সেই যুদ্ধে বিপুল রাক্ষসকুলও নির্ম্মূল হইত না। যেথানে যত প্রকার যুদ্ধ হইয়াছে "মেদিনী ও রমণীই" তাহার মূল কারণ। উপস্থিত পঞ্জাব রাজের সহিত অযোধ্যাধিপতির এই যুদ্ধ সংঘটন কেবল মাত্র যামিনীকে লইয়া, যামিনীর সহিত সংগ্রাম সিংহের বিবাহ হইলে, আর কোন গোলই হইত না, আর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারকে যুদ্ধের বর্ণনার জন্য এত মাথা ঘামাইতে হইত না। পাঠক! সম্মুখে সুবিস্তৃত রণভূমি, আসুন, আমরা একবার এই সময় রণাঙ্গন দর্শন করিয়া আসি।

পাঞ্জাব কেশরী আজ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে রণরঙ্গে মত্ত হইয়াছেন। চিতোর রাজ সাধনসিংহ আজ এই যুদ্ধের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ বিজয়ী হামিরসিংহ আজ এই সৈন্যদলের নেতা হইয়া সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। আজ যেন স্বয়ং ভীষ্মদেব কুরু সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া রণে অগ্রসর হইয়াছেন, বৃদ্ধ রাণা ভীমসিংহও অশ্বারোহণে যুদ্ধের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, হামিরসিংহের রণনিপুণতা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেছে।

তেজসিংহও যুদ্ধভূমির বিপরীত দিকে আপনার সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহেরও সৈন্য সংখ্যা বড় কম নহে; তবে বিপক্ষদলের ন্যায় খ্যাতনামা যোদ্ধা তাদৃশ নাই। সেনাপতি এবং বিজয়সিংহ স্বয়ং যুদ্ধের পরিচালক রূপে অবতীর্ণ, আর ওটী কে? গেরুয়া বসনাচ্ছাদিত বপু, ভীম পরাক্রম মল্লবেশে সজ্জিত ঐ যুবকটী কে? মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সাক্ষাৎ যমোপম, অসি চর্ম্ম হস্তে যোদ্ধবেশে সমর—সাগরে ঝাপ দিয়াছেন, পাঠক! ইহাকে কি চিনিতে পারিয়াছেন—ইনি আমাদের চির পরিচিত যামিনীর প্রাণের প্রাণ—হৃদয়বল্লভ তাপস-কুমার, মধ্যম পাণ্ডব ভীম-সেনের ন্যায় সমরে অতুল বিক্রম দেখাইতেছেন। তেজসিংহ অসি

হস্তে সমরে অগ্রসর হইলে; যেন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব সমস্ত দগ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ অনুমান হইতে লাগিল। বিপক্ষ পক্ষের অসংখ্য শিক্ষিত সেনা সত্বেও যেন জয় আশা দুরাশা বলিয়া মনে করিতে হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, চারিদিকে কাটাকাটি মারামারি আরম্ভ হইল নররক্তের নদী বসুধা রঞ্জিত করিয়া প্লাবিত হইল। বিজয়সিংহ ও সেনাপতি বিশেষ দক্ষতার সহিত অসি চালন করিতে লাগিলেন। আর তেজসিংহের ত কথাই নাই; তিনি সমরে এরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন, যে দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই; তাঁহার সম্মুখে যিনি আসিতেছেন—তিনিই শমন ভবনে গমন করিতেছেন; অদ্যকার সমরে তেজসিংহকে সকলেই কৃতান্ত সমান জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। যুবকের বল বিক্রম দেখিয়া সকলেই এককালে বিস্মিত হইতে লাগিল; ত্রাহি ত্রাহি রবে সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল; এইবার সাধনসিংহ তেজসিংহের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—রে পাষণ্ড! আজ দেখিব, তোর তাপস অঙ্গে কত বল, আজ আমার হস্তে তোর কোনমতেই নিস্তার নাই, এই বেলা তোর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর? তেজসিংহ সাধন-সিংহকে সম্মুখে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—এতক্ষণ কেবল দুর্ব্বলের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, এইবার মূঢ় তোকে সম্মুখে পাইয়াছি, আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই। এই বলিয়া উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয়েই সমকক্ষ বীর; কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছেন না। তেজসিংহ তপোবনে অনেক যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইবার কৌশলে সাধনসিংহের অশ্বকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। সাধনসিংহ ক্ষত্রিয় বীর, তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া পদব্রজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা

শব্দে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। তেজসিংহ এইবার অবসর বুঝিয়া এক লম্ফে যেমন সাধনের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিবেন, অমনি একজন তেজঃপুঞ্জ কলেবর সুদীর্ঘ জটাজাল বিলম্বিত, আনাভি-শ্মশ্রু যোগীবর উভয়ের মধ্যে আসিয়া উভয়কে বাহুদ্বারা বাধা দিয়া বলিলেন—বৎসগণ! ক্ষান্ত হও, ভ্রাতৃ বিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বিশেষতঃ দেবাদিদেব সদৃশ ঋষিবরের অকস্মাৎ আবির্ভাব ও অমানুষিক সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তেজসিংহ এতক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক্ষণে এই মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং যোগীর পদধুলি গ্রহণ করতঃ লজ্জায় অধোবদন হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। পাঠক! আপনারা কি এই সন্ন্যাসী মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিয়াছেন? ইনি আমাদের তেজসিংহের পালক পিতা ও পরম গুরু সিদ্ধান্ত দেব। সিদ্ধান্ত দেব যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ তাঁহার বহুদিনের আশার পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন বলিয়া, মনের আনন্দে এতদূর আসিয়াছেন। সিদ্ধান্তদেব যেন সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, শান্তিময়ের আগমনে সমরানল নির্ব্বাণ হইল। শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! চারিদিকেই শান্তি বিরাজিত, সাধুপ্রকৃতি মহারাণা ভীমসিংহ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নিকটে আসিলেন; এবং সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। সিদ্ধান্তদেব মহারাণা ভীমসিংহকে চিনিতে পারিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—বৎস! পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হয় কি? তুমিই না একদিন সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনগমন করিয়াছিলে, পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছিলে? আমি তোমাকে সেই সময় নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিয়া, এবং অচিরে পুত্র

রত্ন লাভ করিবে বলিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক পুত্র লাভ করিয়া সুখী হইয়াছ, এক্ষণে আর এক অসীম পরাক্রমশালী পুত্ররত্ন লাভ করিয়া অকুতোভয়ে রাজ্য প্রতিপালন কর। এই বলিয়া তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া মহারাণার করে অর্পণ করিলেন।

তেজসিংহ পূর্ব্বকার ঘটনা স্মরণ করিলেন এবং সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। সাধক প্রবর সিদ্ধান্তদেব মহারাণাকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন—বৎস! শোক করিও না, যবনযুদ্ধের সময় পদ্মাবতীর যে তিন দিনের শিশু যবন কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিয়াছিলে, সেই শিশু আমার আশ্রমে এতদিন প্রতিপালিত হইয়া, এক্ষণে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সাহস ক্ষমতায় এই বালক তোমার পুত্র নামের যোগ্য—এইজন্য ইহার নাম রাখিয়াছি "তেজসিংহ।" অতঃপর ইহাকে লইয়া তুমি সসাগরা ধরার পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাক। এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহারাণা নিস্পন্দ, নীরব, চেতনা নাই। ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্ষণপরে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইলে তিনি বলিলেন—হায় একি স্বপ্ন! সৈন্য সামন্ত, স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই অবাক নিস্পন্দ, কাহার মুখে কোন বাক্য স্ফুরণ হইতেছে না।

মহারাণা আনন্দে অধীর হইয়া হারানিধি ক্রোড়ে লইলেন। সাধনসিংহ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তেজসিংহও বলিলেন—দাদা! অজানিত অবস্থায় যে সকল দোষ করিয়াছি, কনিষ্ঠের সে সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন, বলিয়া সাধনের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সাধন কনিষ্ঠের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিলেন

সেনাপতি হামিরসিংহ আসিয়া তেজসিংহকে অভিবাদন করিল; এইরূপে সমরসাগর যেন সুখসাগরে পরিণত হইল।

মহারাণা ভীমসিংহের আজ আনন্দের পরিসীমা নাই। তিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলকেই করযোড়ে বলিলেন—মহাত্মাগণ! আজ আপনাদেরই কৃপায় আমার হারানিধি, পদ্মার অঞ্চলের ধন—তেজসিংহকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। আপনাদের দর্শন লাভে আমার এইরূপ পরম সৌভাগ্যের উদয় হইল, অতএব শত্রুতা ভুলিয়া আসুন সকলকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি এবং অদ্য আমার অনুরোধ এই যে—সকলে শত্রুতা ভুলিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক অধীনের বাসে পদার্পণ করুন; আজ এই মহাআনন্দের দিনে আমি বন্ধুগণের পদধূলি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব; এবং সকলে মিলিত হইয়া সাক্ষাৎ দেবতা সদৃশ আমার এই অভীষ্ট দেবতা যোগীবরের প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

ভীমসিংহকে সকলেই মান্য করিতেন, বিশেষতঃ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন, কেহ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন। মহারাণা সিদ্ধান্তদেবকে অশ্বযানে বসাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, যে বিজয়সিংহও সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাণার গৃহে গমন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সুসংবাদ ক্ষণকাল মধ্যেই চারিদিকে প্রচারিত হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হারানিধি প্রাপ্তি।

পুত্র যে পিতামাতার কিরূপ আদরের বস্তু; তাহার অদর্শনে পিতামাতার যে কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা অন্যে কি বুঝিবে? পিতা-মাতাই জানেন—সন্তান তাঁহাদের কিরূপ হৃদয়ের ধন। পুত্রের অদর্শন জনিত দুঃখ যে কতদূর হৃদয়-বিদারক, ভুক্তভোগী পিতামাতাই তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে এ বিষয় লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য।

মহারাণা ভীমসিংহ বৃদ্ধ বয়সে যে দুঃসহ শোকে অধীর হইয়াছিলেন; যে দুর্বিসহ পুত্র শোকাগ্নিতে এতদিন তাঁহার অন্তর্দাহ হইতেছিল,—ভগবানের কৃপায় এতদিন পরে সে শোকবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সুখের তরঙ্গ সমুত্থিত হইতে লাগিল—হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সুখ-সরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন।

ভাগ্যের কথা কেহই বলিতে পারে না। সংসারে কাহার ভাগ্যে যে কখন সুখোদয় হয়, কখন যে দুঃখ তিমিরে ভাগ্যাকাশ অন্ধকারময় করে,—তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। আজ যাহাকে সুখস্রোতে ভাসিতে দেখিতেছি, কল্য হয়ত তাহাকে মলিন বদনে ভ্রমণ করিতে দেখিতে হইবে। আবার অদ্য যাহাকে বিষন্ন বদনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া হতভাগ্য বোধে সকলে হতশ্রদ্ধা করিতেছে; কল্য হঠাৎ তাহার সৌভাগ্যোদয় দেখিয়া সকলকেই চমকিত হইতে হইবে। বিধাতার কার্য্যই এইরূপ, কাহাকেও হাসাইতেছেন, কাহাকেও কাঁদাইতেছেন। বিধাতার লীলা খেলা ভ্রমান্ধ মানব বুঝিয়াও বুঝে না—তাই অসার চিন্তায় অহরহ দগ্ধ হইয়া কেবল আমার আমার করিয়া মরে, ভুলেও চিন্তামণির চরণ চিন্তা করে না; বৃথায় এই অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করে।

অধর্ম্মের পথ আপাততঃ মধুর এবং সহজগম্য হইলেও পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর। ধর্ম্মের পথ বড়ই জটিল, ইহার গতি বড়ই মন্থর এবং বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া অল্পায়ু কলির জীব অধৈর্য্য হইয়া পড়ে; ধর্ম্ম পথভ্রষ্ট হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, পরকাল নষ্ট করে, কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলে পরিণাম বড়ই সুখকর, সেরূপ সুখ জাগতিক কোনও কার্য্যে পাওয়া সম্ভবপর নহে।

ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করতঃ ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পরিণাম তাদৃশ সুখকর হইয়াছিল; প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা নলের পরিণাম যে পরিশেষে কিরূপ আনন্দপ্রদ হইয়াছিল, শাস্ত্রপাঠী পাঠক-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অদ্য আমাদের ধর্ম্ম-প্রাণ মহারাণা ভীমসিংহের সৌভাগ্য কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল—পাঠক! তাহাও অবগত হইতেছেন। তাই বলি, সুবিমল সুখভোগ

করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মই অনন্ত সুখের নিদান স্বরূপ।

ভীমসিংহ দুইটী পুত্রের সহিত রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সিদ্ধান্ত-দেবের চরণ বন্দনা করিতে করিতে পাঞ্জাবস্থিত নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে আনন্দ দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। ভীমসিংহ নিজ সিংহাসনে সিদ্ধান্তদেবকে উপবেশন করাইয়া আপনি পদতলে উপবেশন করিলেন। সাধনসিংহ ও তেজসিংহ মহারাণার দুইপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অপরাপর রাজন্যবর্গ ও বন্ধুবান্ধব সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অদ্য রাজসভার শোভা সন্দর্শন করিলে অমরধামে ইন্দ্রসভা বলিয়া ভ্রম হয়; অথবা স্বয়ং স্বয়ম্ভু ভোলা-নাথ যেন সিদ্ধান্তদেবরূপে মর্ত্তে আগমন করিয়া, ধার্ম্মিক মহারাণা ভীমসিংহকে কৃতার্থ করিতেছেন। রাজার আনন্দে প্রজার আনন্দ, মহারাণার এবম্বিধ ভাগ্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রজাগণ জয়নাদে চারিদিক নিনাদিত করিতে লাগিল।

সিদ্ধান্তদেব সকলকে বসিতে অনুমতি প্রদান করিয়া মহারাণাকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন,—বৎস! পুত্রশোকে সন্তপ্ত রাজ্ঞীগণকে একবার এই শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া আইস।

ভীমসিংহ সন্ন্যাসীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সিদ্ধান্তদেব সমাগত রাজাগণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন

ভীমসিংহ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র রাজ্ঞীদ্বয় নিকটে আসিয়া যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহারা জানেন না যে অদ্যকার যুদ্ধে বিধি তাঁহাদের বহুদিন অপহৃত নিধি মিলাইয়া দিয়াছেন। মহারাণা রাণীদ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—

পদ্মিনি! এবার যুদ্ধ হইতে না হইতেই জয়লাভ হইয়াছে—তাহার পুরস্কার স্বরূপ ভগবান তোমার জীবনের জীবন, হারাধন আনিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে যে পুনরায় আমার ভাগ্যে এরূপ সুখভোগ হইবে, বহুদিন অপহৃত,—তিনদিনের শিশুসন্তান যে উপযুক্ত হইয়া আমাকে পুনরায় পিতৃসম্বোধন করিবে; এ আশা ছিল না। তবে ভগবান সকল জীবের রক্ষাকর্ত্তা, তিনি সিদ্ধান্তদেবরূপে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন। আইস! আমরা উদ্দেশে তাঁহার চরণে প্রণাম করি। পরমযোগী সিদ্ধান্তদেবও রাজ সভায় সমাগত; অচিরে তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে।

রাজ্ঞী সুশীলা ও পদ্মাবতী মহারাণার কথার বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইলেন না, তাঁহারা করযোড়ে প্রণাম করতঃ মহারাণার বদন প্রতি বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময়ে সিদ্ধান্তদেবের আদেশে মন্ত্রি মহাশয় সাধনসিংহ ও তেজসিংহকে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—বীর প্রসবিনী মা পদ্মাবতি! এই লও তোমার অঞ্চলের নিধি, হৃদয় আকাশের একমাত্র ধ্রুব তারা তিনদিনের শিশু সন্তান, যাহার জন্য আপনি মণিহারা ফণিনীর ন্যায় এত দিন জীবন্মৃতবৎ কালযাপন করিতেছিলেন; দয়াময় করুণাসিন্ধু ভগবানের করুণা কটাক্ষে সেই শিশু এতদিন জীবিত থাকিয়া আরবল্লী পর্ব্বতের গুহতম গুহায় পূজ্যতম ঋষিবর সিদ্ধান্তদেবের তপোবনে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বালকের অমিত পরাক্রম দেখিয়া ঋষিবর ইহার নাম রক্ষা করিয়াছেন 'তেজসিংহ' ইনি পিতা মাতার অনুরূপ সমস্ত সদ্গুণ ও যুদ্ধবিদ্যায় বিভূষিত। এতদিন সিদ্ধান্ত দেব ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাদের পুত্র আপনারা গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করুন।

এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় পদ্মাবতীর হস্তে তেজসিংহকে সমর্পণ করিলে, তেজসিংহ জননীচরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন; পিতা ও সাধনজননী সুশীলার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সুশীলা ও পদ্মাবতী নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ। কোন্ পুণ্যফলে যে তাঁহাদের পুনরায় এতাদৃশী সৌভাগ্যোদয় হইল, তাহার কিছুমাত্র তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। যে হারানিধি পাইবার কোনই আশা ছিল না; স্বপ্নেও যাহাকে পাইবেন বলিয়া মনে করেন নাই, অদ্য সেই উপযুক্ত পুত্ররত্ন লাভ করিয়া পদ্মিনী যে কিরূপ আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

অতিরিক্ত আনন্দোদয় হইলেও মানব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়; পদ্মিনী পুত্ররত্নকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া আনন্দে একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন। এক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন—"বাপরে, দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন; এতদিন এ অভাগিনীকে ভুলিয়া কেমন করিয়া ছিলে বাপধন; আমি যে তিন দিনের শিশু তোমাকে ধাত্রী ক্রোড়ে সম্প্রদান করিয়া, মহারাণার উদ্ধারার্থ যুদ্ধে গিয়াছিলাম। জীবনধন! আজ বুঝি আমি সেই পুণ্যফলে পুনরায় তোমাকে ক্রোড়ে পাইলাম। এক্ষণে তোমার পালনকর্ত্তা যোগীশ্বর সিদ্ধান্তদেবের চরণ দর্শন করাইয়া এ জনম-দুঃখিনীকে কৃতার্থ কর।"

জননীর সুধামাখা বাক্য আকর্ণন করিয়া তেজসিংহ বলিলেন—মা! তাঁহাকে দেখিবার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে রাজসভায় উপস্থিত; পিতার অনুমতি লইয়া আপনারা তাঁহার চরণ দর্শন করতঃ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করুন। তেজসিংহ এই সর্ব্বপ্রথম সুমধুর "মা" শব্দ মুখে উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ে যে কি অপ. আনন্দ লাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা দুঃসাধ্য।

ক্রমশঃ বেলা অধিক হইতে লাগিল। মহারাণা ভীমসিংহ আর অন্তঃপুর মধ্যে অপেক্ষা না করিয়া সভা মধ্যে আগমন করিলেন। এ দিকে মন্ত্রী ও সাধনসিংহ পিতার অনুমতি লইয়া সমাগত রাজন্যবর্গের জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাপসপ্রবর সিদ্ধান্তদেবের জন্য নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে পর মহারাণা ভীমসিংহ গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং বহুমূল্য রত্নখচিত কারুকার্য্য বিশিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করাইয়া অতি উপাদেয় সামগ্রী সকল আনিয়া দিলেন। নির্ব্বিকার-চিত্ত সাধু সিদ্ধান্তদেব আপন ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিয়া পরিতোষের সহিত ভোজন ক্রিয়া সমাধা করিলেন। ওদিকে মন্ত্রী মহাশয় ও সাধনসিংহের তত্ত্বাবধানে অপর সকলের ভোজন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। যোগীবর সিদ্ধান্তদেবের পদার্পণে রাজবাটীতে মহাধুম হইতে লাগিল। রাজবাটীর সামান্য দাস দাসী হইতে সকলেই মহানন্দে মত্ত হইল। রাজ্ঞী পদ্মিনীর আনন্দ বর্ণনাতীত; তিনি আজ হারানিধি কোলে লইয়া আনন্দে মাতুয়ারা; যেন রাম-জননী কৌশল্যা দেবী চৌদ্দবৎসর পরে নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া সুখসাগরে সন্তরণ দিতেছেন।

রজনীদেবীও বুঝি আর থাকিতে পারিলেন না—তিনিও যেন রাজপরিবারের সহ সুখানুভব করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর পরিধান করতঃ তারাহারে সজ্জিত হইয়া রজনীদেবী যেন হাসিতে লাগিলেন। অদ্য রজনীযোগে মহারাণা ভীমসিংহের রাজপ্রাসাদে পুনরায় আর একটী দরবার বসিল। অযোধ্যাধিপতি বিজয়সিংহ এই সভায় সিদ্ধান্তদেব সমক্ষে মহারাণার নিকট নিজ কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার

কথার অনুমোদন করিল, ঋষিসম্রাট সিদ্ধান্তদেব বিজয়সিংহের কথা শ্রবণ করিয়া তেজসিংহের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। যখন সিদ্ধান্ত দেবের মত স্থির হইয়া গেল; তখন অপর আর কাহারও অমত রহিল না, সকলেই এক বাক্যে সিদ্ধান্তদেবের পক্ষ সমর্থন করিলেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রথমতঃ গুরুগৃহে পাঠাভ্যাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত নিয়ম শিক্ষা করিয়া তবে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। এরূপ নিয়মে সংসারী হইলে আর কাহাকেও সংসার দায়ে দগ্ধ হইয়া অশেষ প্রকারে জ্বালাতন হইতে হয় না। তেজসিংহ আর্য্যগণের চির প্রচলিত নিয়মানুসারেই সংসারী হইলেন।

*　　*　　*　　*

অযোধ্যাধিপতি বিজয়সিংহতনয়া যামিনীর সহিত তেজসিংহের শুভবিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল; আগামী শুভলগ্নে বিবাহ হইবে।

ভীমসিংহ পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া সভাস্থ সভ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—যখন আমার পূজনীয় গুরুদেব, তেজসিংহের রক্ষাকর্ত্তা সিদ্ধান্তদেবের অনুমতি হইয়াছে, তখন বিজয়সিংহ তনয়া যামিনীর-সহ তেজসিংহের পরিণয়কার্য্য সমাধা করিতে আমার কিছুমাত্র অমত নাই; তবে শুনিতেছি—যামিনীর সহিত পাঞ্জাবাধিপতির পুত্র সমরসিংহের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সমরসিংহও আমার পরমাত্মীয় এক্ষণে তাহার বিবাহের জন্য কিরূপ কর্ত্তব্য স্থির করা যায়? মহারাণার কথার প্রত্যুত্তরে বিজয়সিংহ বলিলেন—মহারাজ। তাহার জন্য আর চিন্তা কি—আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী "অনুপমার" সহিত উক্ত শুভলগ্নেই সমরসিংহের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইবে, সভাস্থ সকলেই বিজয়সিংহকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তেজসিংহ ও সমরসিংহের বিবাহবার্ত্তা স্থির

হইল। অন্তঃপুর মধ্যে এই শুভসংবাদ ঘোষিত হইবামাত্র সকলে মহানন্দে "হুলু" ধ্বনি দিতে লাগিল। পদ্মিণী আনন্দে আত্মহারা, তিনি ইহ-জীবনে কখন এরূপ আনন্দ উপভোগ করেন নাই। ক্রমে রজনী অধিক হইল, রজনী যাপন মানসে সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলেন।
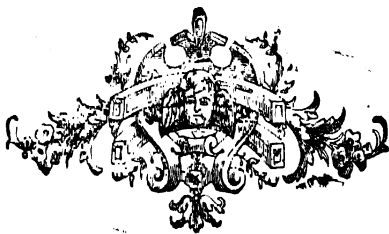
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহের পরিণয়।

মানব জীবনে বিবাহের তুল্য আমোদ আর নাই। অন্যান্য জাতির বিবাহ সংস্কার অপেক্ষা হিন্দুর বিবাহ সংস্কার অতীব সমারোহজনক, হিন্দু এরূপ ব্যয় বিধান আর কোন কার্য্যেও করেনা, এরূপ আড়ম্বরও আর কোন কার্য্যে নাই, দুইটী অপরিচিত প্রাণ একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে বিবাহ সূত্রই প্রধান; দুইটী প্রাণ একত্র মিলিত হইয়া একটী হইতে, কেবল পরিণয় কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। পর আপন হইবার এমন বন্ধন জগতে আর নাই। এই প্রণয় বন্ধনই বিধাতার সৃষ্টিতত্ত্বের আদি ও মূল কারণ। স্ত্রী-পুরুষের এরূপ সম্মিলন না হইলে ভগবানের এই বিশাল বিশ্বরাজত্বের অস্তিত্বমাত্রও থাকিত না। স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনই সংসারের একমাত্র লক্ষ্য; নির্ব্বাচিত পতিব্রতা স্ত্রীধন লাভ করা মনুষ্যজীবনে একটী পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই জন্য বিবাহ হিন্দুসংসারে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

আজ সেই অতীব দায়িত্বপূর্ণ, পরিণয় সূত্রে আমাদের তাপস-কুমার তেজসিংহ আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হইতেছেন। অদ্য অযোধ্যাধিপতি বিজয়সিংহ-তনয়া যামিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে; তাই পাঞ্জাব-স্থিত মহারাণা ভীমসিংহের প্রাসাদ এতাদৃশ আড়ম্বরের সহিত সজ্জিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের এমন নয়ন-মনোহর সাজ সজ্জা আর কখন হয় নাই। যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই নয়নের প্রীতি-প্রদ নানাবিধ সাজে হর্ম্মাবলী ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, প্রাসাদ-তোরণে রক্ষকগণ বিবিধ বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করি-তেছে; রাজপথ সকল নানাবিধ পুষ্পমালা ও ধ্বজা পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। পাঞ্জাব কেশরীর একমাত্র পুত্র সমরসিংহের বিবাহ উপলক্ষেও মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। দুইটী বিবাহ আড়ম্বরে পাঞ্জাবপ্রদেশের যে কি এক অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে, তাহা বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। অযোধ্যাধিপতি বিজয়সিংহ নিজ তনয়া যামিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লইয়া পাঞ্জাবপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এইস্থানেই আজ সকলের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

* * * *

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাজভবন আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া অন্ধ-কার নাশ করতঃ দিবালোকবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ক্রমে শুভ লগ্ন সমুপস্থিত হইলে সিদ্ধান্তদেব মহারাণাকে স্বজনগণের সহিত যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মহারাণা ঋষিবরের আজ্ঞা শিরো-ধার্য্য করিয়া শুভযাত্রা করিলেন, বলা বাহুল্য—সিদ্ধান্তদেবও বিবাহ আসরে উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ও দিকে সমরসিংহও বরবেশে সজ্জিত হইয়া স্বগণে সভাস্থ হইলেন।

বিবাহের মহাধূম পড়িয়া গেল; চারিদিকে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল।

বিজয়সিংহ সিদ্ধান্তদেব ও বৈবাহিক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া প্রথমে নিজ তনয়া যামিনীকে তেজসিংহের করে সম্প্রদান করিলেন, পরে সমরসিংহের করে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলেন। সভাস্থ সকলে এই দুই শুভসংযোগ দর্শন করিয়া সুখী হইল, সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল,—মহাযোগী সিদ্ধান্তদেব সম্মুখে এই অপূর্ব্ব মিলন বাস্তবিক বড়ই প্রীতিপ্রদ; আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান এই নব দম্পতীযুগলকে চিরকাল সুখে রাখুন।

বিবাহ হইয়া গেল; তেজসিংহ ও যামিনী এবং সমরসিংহ নব পরিণীতা ভার্য্যাসহ পৃথক বাসর গৃহে নীত হইলেন।

মানুষ যে কার্য্যই করুক না কেন, ভোজনের ব্যবস্থা সকলের অগ্রে, আহারাদির ব্যবস্থা না হইলে যেন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; তাই আমাদের সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণ ভোজন, স্বজাতি ও অন্যান্য জাতির ভোজন ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। লোকজনকে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিবার তুল্য আমোদ আর কিছুতেই নাই; দাতা জানেন ইহাতে তাঁহার কিরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, দৃষ্টিকৃপণ ইহা করে না, সে ইহার আমোদ কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে; পুত্রমুখাবলোকন করিবার যে কি আমোদ, তাহা অপুত্রক ব্যক্তি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে?

ক্রমে সমাগত লোক সকলের আহারাদি হইয়া গেল; রাজভোগে উদর পূর্ণ করিয়া সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল; বিবাহ রজনী ভোজন ব্যাপারেই শেষ হইয়া গেল। রজনী প্রভাতা হইলে বিজয়-সিংহ কন্যা বিদায়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহামূল্য যৌতুক প্রদান করিয়া বর ও কন্যা বিদায় করিলেন। এত দিন প্রতিপালিত

হইয়া যামিনী আজ পরগৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিতে গেল; প্রাণের একমাত্র ললামভূতা, আদরে প্রতিপালিতা যামিনী আজ বিজয়-সিংহের পর হইয়া গেল।

কন্যারত্ন বিবাহ হইলেই পিতার গোত্র হইতে স্বামীর গোত্রে আসিয়া পড়ে, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সে পিতামাতার একপ্রকার পর হইয়া যায়, তাহার দ্বারা পিতৃকুলের আর কোন কার্য্যই হয় না।

মহারাণা ভীমসিংহ নিজ বৈবাহিক বিজয়সিংহকে নানাবিধ মধুরবাক্যে আপ্যায়িত করিয়া পুত্র ও পুত্রবধু সহ নিজ ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সমরসিংহও সস্ত্রীক আপন আলয়ে গমন করি-লেন। শুভ সময় দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া গেল।

মহারাণা ভীমসিংহ আপন প্রাসাদে আসিয়া পুত্রের হিতার্থে অসংখ্য ধন রত্নাদি দান করিয়া, দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে হিন্দু রাজার রাজ্যে কোনও আমোদজনক কার্য্য হইলে, রাজার প্রাসাদে রাজ্য অধীন হইল, প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখের একশেষ হইত, এখন রাজা বিদেশীয় বিজাতীয় কাজেই প্রজাবর্গের সুখের আশাও চিরতরে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। এখনকার রাজাগণের নিকট আমাদের সুখের আশা করা, নিতান্তই ভ্রান্তির কারণ ব্যতীত আর কি বলিবে।

রাজ্ঞী পদ্মাবতী বহুদিনের পর পুত্র রত্ন লাভ করিয়া যাদৃশ আন-ন্দিত হইয়াছিলেন অদ্য নববধুর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা নাই, তিনিও মহারাণার ন্যায় অকাতরে দরিদ্রগণকে ধন দান করিতে লাগিলেন।

রাণী সুশীলাও এ আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, সামান্য রমণীর মত তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সপত্নী বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত

হয় নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একদিনের জন্যও মনোমালিন্য সঙ্ঘটন হয় নাই, দুই বিবাহে এরূপ সদ্ভাব বোধ হয় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুশীলা সাধন ও সরোজিনীকে পাইয়া সুখী হইলেন, আমাদের পতিব্রতা পদ্মাবতী এতদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখস্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। পাঠক! বলিতে পারেন, এই অতুলনীয় সুখ-স্রোতের মূল কারণ কি? বিশেষ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে ধর্ম্মই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে।

উপসংহার।

—৵৪৶—

পুত্রহারা জনক জননী পুত্ররত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; তাহারা স্বজনগণে ক্রমান্বয়ে একমাসকাল পাঞ্জাব রাজধানীতে বাস করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ধর্ম্মের রাজত্বে, শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধার্ম্মিক রাজার রাজ্য যে মূর্ত্তিমতী শান্তি ও পবিত্রতার আধার হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সূর্য্যোবংশোদ্ভব চিতের ও মিবার রাজাগণ চিরকালই প্রজাবৎসল, এক সময়ে তাঁহাদের যশোরাশি বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের দিকদিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল এক সময়ে বিন্ধ্যমেখলা জাহ্নবী-বিধৌত এই পবিত্র দেশ অসংখ্য বীর সন্তানের প্রসূতি ছিল, এক সময়ে পরাধীন দেশ নিজকীর্ত্তি মালায় মণ্ডিত হইয়া সর্ব্বোন্নত হইয়াছিল। তখনই বা দেশের অবস্থা কেন সেরূপ ছিল আর এখনই বা কেন এমন হইয়াছে? তাহার কারণ আর কিছু নহে একমাত্র ধর্ম্ম প্রাণ; প্রজাবৎসল রাজা এবং তাহার অভাব। এমন একদিন ছিল যে দিন বিদেশীয়েরা ভারতের দর্শন, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের নীতি, ভারতের কাব্যের জন্য লালায়িত হইত। এমন একদিন ছিল যে দিন বিদেশীয়েরা ভারতের রাজনীতি পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত এবং স্বদেশের রাজনীতিকে ভারতীয় ভাবে গঠিত করিতে প্রয়াস পাইত। হায়! আজ আমরা কি হইয়াছি? অমরাই কি সেই ভারতীয় আর্য্যজাতি? কোথায় গেল আমাদের সেই মহতী শক্তি? কোথায় তিরোহিত হইল আমাদের সেই গরিয়সী কীর্ত্তি হায়! কোথায় আমরা আর কোথায় আমাদের সেই পুরাতনী কথা। প্রিয় পাঠক! বল দেখি পূর্ব্বের সেই সকল

কথা মনে হইলে প্রাণ কি আবার অতীতের পবিত্র স্মৃতি সলিলে অবগাহন করিতে ধাও হয় না। কিন্তু তাহা বৃথা যাহা নিজের দুর্বুদ্ধি দোষে হারাইয়াছি আর কি তাহা ফিরিয়া পাইব। আর কি, আমরা মহারাণা ভীমসিংহের ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত রাজার রাজ্যে বাস করিয়া মর্ত্তে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিব। হায়! কুহকিনী আশা! আর কি আমাদিগকে সে সুখের রাজ্য দেখাইতে পারিবে, বৃথা আশা।

সিদ্ধান্তদেব মহারাণার সহিত চিতোর রাজধানীতে আসিয়া কিয়দ্দিন বাস করিবার পর স্বস্থান প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় প্রাণোপম তাপস-কুমার তেজসিংহকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! সংসার সুখের আগার; ইহার তুল্য আশ্রম আর নাই; সংসারে থাকিয়া যথার্থ সংসারীর ন্যায় ভগবানের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলে—দুর্ব্বল-চিত্ত মানবের পক্ষে এমন শান্তিপ্রদ স্থান আর নাই; এই স্থানে থাকিয়াই মানব ভোগ মোক্ষ করতলগত করিতে পারে। তবে সংসারে পদে পদে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তবে সংসারী হইতে হয়।

সংসারে কেবলমাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ইহাতে পতন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিপদ আপদে পতিত হইতে হয় সে কেবল সংসারে পরীক্ষিত হইবার জন্য, ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলে, তাহাও ক্ষণিকস্থায়ী হইয়া মানবের চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ করে। সংসারের প্রথম লক্ষ্যস্থল পিতামাতা, এমন পরম হিতকারী বন্ধু আর নাই। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ পিতামাতার সেবা করিলে সংসারে আর কোন ভাবনাই থাকে না। অতএব পিতামাতাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিবে, ইত্যাদি নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান

করিলেন। রাজবাটীর সকলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। পাঠক। আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল আসুন আমরাও যোগীবরের চরণে প্রণত হইয়া অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি, বারান্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার বাসনা রহিল।

সমাপ্ত।